যেমন কাঁদে।...মা'র গলা জড়িয়ে একটি ছোট কৃশ সুশ্রী ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, মা কাঁদ্‌ছে বলে'।

সবাইর সঙ্গে শ্মশানে গেলাম। ফিরে এসে বাকি রাতটা সে-বাড়ীতেই কাটালাম। আর জেগে জেগে খালি বেণুর কান্না শুন্‌লাম।

শুধু প্রচুর নয়, অবিশ্রান্ত!

সকাল বেলা পা যেন আর চল্‌ছেনা,—বিকাশকে খবর দিতে হবে। হয়ত নিষ্ঠুরের মতো বল্‌বে—ভাবনা কি? স্বামীর লাইফ ইন্‌সিওরেন্সে দেবার টাকা আছে,—প্রকাণ্ড বাড়ী। দেখিস্ ঠিক মোটা হয়ে যাবে এবার নিরিমিষ খেয়ে খেয়ে। তারপর কাশী যাবে।

রাস্তায় রাস্তায় করতাল বাজিয়ে কে এক বুড়ো হরিনাম ক'রে ভিক্ষা করছে,—কাঁধে একটা ঝুলি।

চমকে উঠি—আরে, কবরেজ মশাই যে! যিনি আমাদের মেস্-এর নীচের তলায় পিত্তশূলের বড়ি বেচেন।

ফোঁকলা মাড়ি দুটো বার করে' কবরেজ মশাই বল্লেন—আর ক'টা দিনই বা আছি বাবা, হরির নাম করে' যাই।

ট্র্যাম কণ্ডাক্টারের সঙ্গে চেনা ছিল,—ডাক্‌লে। উঠে বস্‌লাম।

কতদূর এগিয়েছি, পেছন থেকে কে বল্লে—যদি কিছু দেন।

চেয়ে দেখি,—লোকটার হাতে একটা জাপানী বাক্স,—চারদিকে আট্‌কানো পেরেক দিয়ে, মাঝখানে পয়সা ফেলার ফুটো। ধারে আঠা দিয়ে একটা কাগজ মারা,—তাতে ইংরিজিতে লেখা, "গরীব ছাত্রদের ফণ্ড্"।

মাথার চুলগুলি সব কেটে ফেলেছে,—দাড়ি গোঁফ কামানো, তেম্‌নি খালি পা, পরনে ও গায়ে ছেঁড়া কাপড় জামা,—কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে,—বিনোদ এ আরেকটা মন্দ ফিকির করেনি।

পকেটে যা কয়েকটা পয়সা ছিল বাক্সে ফেলে দিলাম। আরো অনেকে দিলে।

এর পর বিনোদের বেজায় অসুখ ক'রে বসল,—ভেদ বমি জ্বর, সব কিছু! দু দিনেই যাবার দশা।

বল্লাম—তোমার পারুলকে একটা খবর পাঠাই। ও আসুক!

ও আমার হাতটা কপালের ওপর রেখে বল্লে—বাড়িতে একটা তার্ আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে বল বিকাশকে। আমার মা আর বউ চলে আসুক।

—বউ?

—হ্যাঁ। নাম নগবালা।

ওর মা আর বউ এল দুদিন বাদেই। অবস্থা বেশ সঙিন্ হয়ে আস্‌ছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আপিস্ নেই—অখিলবাবুরও না।

ওর মা খালি কাঁদে, কিন্তু ওর বউ একটা টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করে না। খালি চুপ ক'রে ব'সে থাকে।

বিকাশ বলে—আমার হাত থেকে কোন রুগীকেই যম ছিনিয়ে নিতে পারে নি। এবার বোধ হয় প্রথম নেবে। বোধ হয় বেণুর অভিশাপ লেগেছে।

সকাল বেলা আশ্চর্য্য রকম অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা গেল। বিনোদ জ্ঞান পেয়ে ওর মা আর বউকে চিন্‌তে পার্‌লে।

একলা পেয়ে বিকাশকে বল্লাম—এ কেমনতর বউ ভাই? মর্‌তে চলেছে দেখে একটুও কাঁদ্‌লে না, ভালোর দিকে দেখে একটু খুসীও হল না। একটি কথা কইল না পর্য্যন্ত।

বিকাশ বল্লে—ও যে বোবা।

—বোবা? বলিস কি?

—হ্যাঁ।

—তবে পারুল ?

—দূর্ বোকা! তাও বুঝি বুঝতে পারিস নি। পারুল বলে' কেউ নেই। তাকে ও মনে মনে রচনা করেছে। তাই ত' পারুল বিয়ে করেনি। তাই ত' ওর সঙ্গে মিলনের জন্ত দুঃখের তপস্তা করছে।

বৈঠকখানায় ঢুকলাম, বনজ্যোৎস্না টেবিলের কাছে চুপচাপ বসে আছে। কি লিখ্বে তাই ভাব্ছে যেন। আঁচলটা তেম্নি পায়ের কাছে লুটোনো।

বল্লাম—মুণালিনি কেমন আছে ?

বনজ্যোৎস্না লেখার থেকে চোখ না তুলেই বল্লে—এইমাত্র ওঁরা ওকে শ্মশানে নিয়ে গেলেন। ভালোই আছে

প্রবোধের বাড়ীর লণ্ঠনটা,—আবার।

ওগো বিদ্যুল্লতা—

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

ওগো বিদ্যুল্লতা,
আমার পরাণে কেন তুমি আজি
দীপ্তি-রচন-রতা ?
মেঘের কণ্ঠে জ্যোতির মালিকা
কেন দিছে, হায়, পরালে, ক্ষণিকা ?
স'বে না সে ভার, ছিঁড়ে যাবে ডোর
নিবে যাবে সব আলো ;—
অকূল আকাশে তুমি মিলাইবে
মধুর স্বপন যথা ;
আমারি হৃদয়ে ঘনাবে আবার
কৃষ্ণা নিশির কালো !
তবে রেখে দাও এক নিমেষের
আলোকের ফুল্লতা,
ওগো বিদ্যুল্লতা !

ওগো বিদ্যুল্লতা,
আমার হৃদয়ে কেন তব আজি
এমন চঞ্চলতা ?
ধরিয়া রাখিতে কভু পারিব না
তব হাসিটির তরলিত সোনা,
তুমি মিলাইলে সে নব-আঁধার
সহিব কেমন করে' ?
মিছে মোরে আজি তুলিলে উজলি'
আলোক-বিতর-ব্রতা!
তুমি চলে' যাবে, আমি রব পড়ে'
ঘন-আঁধারের ঘোরে—
বলে' দাও মোরে কেমনে সহিব
সে অসীম শূন্যতা—
ওগো বিদ্যুল্লতা!

প্রভাকর

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

বারম্বার হতাশ হইয়া ধিক্কারে শেষে এই কথাটাই মনে প্রবল হইয়া উঠিল যে, লক্ষ লক্ষ শিশুর মৃত্যু এই দেশে প্রতিবৎসরই ঘটে; কিন্তু আমি যে বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম সে-বার কেন এমন বিপরীত ঘটিল!...আমিও কেন লক্ষ লক্ষের মড়কের হিড়িকে পড়িয়া তাহাদের সঙ্গী হইতে পাইলাম না! ..প্রশ্নের উত্তরটাও যেন মিলিয়া যায়।—জীবনাতীত আর ধারণাতীত কোনো স্থানে স্বর্গ নরক অবস্থিত নহে, তারা এইখানেই। যে শিশু মরে সে বাঙলা দেশের বাহিরে যাইয়া বাঁচে; আর যাদের সুখস্থানে শনি তাহারাই নরককুণ্ডে রহিয়া যায়...উপরন্তু আহারের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া দিন দিন বেশ বড় হইয়া উঠিতে থাকে।—

জুতা ক্ষয় হইয়া যদি পা ক্ষয় হইত তবে এতদিন আমার পা ক্ষয় হইতে হইতে কোমর পর্য্যন্ত না উঠুক হাঁটু ধর্‌ ধর্‌ নিশ্চয় করিত—

এত হাঁটিয়াছি।

কেবল একটি চাকরীর খোঁজে।

বলা বাহুল্য চাকরী মিলে নাই; মিলিলে শিশুমৃত্যুর কথাটা তুলিতাম না।—

পাঁচ সাত জোড়া জুতা ছিঁড়িয়া মাটি হইবার পর, আঃ, বাঁচিলাম—

চাকরী মিলিল। মাষ্টারী, মাহিনা বাঙালী বি. এ-র পক্ষে মোটাই—পঞ্চাশ।

বিছানা আর ট্রাঙ্ক লইয়া শুভক্ষণে রওনা হইলাম। মনে মনে জপ করিতে করিতে চলিলাম, ঠিকানার নামটি—প্রভুরামপুর, বিজন-ভবন, যুগশিক্ষায়তন। নিয়োগপত্রে জানিয়াছিলাম, গ্রাম-সনাতন ষ্টেশনে নামিয়া তের মাইল পথ গো-যানে অতিক্রম করিয়া যুগশিক্ষায়তনের দ্বারে পৌঁছিতে হইবে।—

দু'চারিটি বিভিন্ন নামের ভূখণ্ড ব্যতীত বিপুলা পৃথ্বীর আর সমস্তই অজানা। পরিচিত স্থান আর প্রিয় আবেষ্টনের কেন্দ্র ছাড়িয়া অপরিচিত লোকালয়ে অনিশ্চিতের মধ্যে যাইয়া পড়িবার ভয় ভয় ভাবটা ছিল না এমন নয়, কিন্তু প্রাণে মুক্তির একটা ছল্‌ছল্‌ পুলকধারা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতেছিল। ..

বাবা বৃদ্ধ, অক্ষম। অনটনের ভিতর দিয়া সংসারটাকে যেন সূক্ষ্মমাত্র শারীরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা সঙ্কুচিত করিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিতে হইয়াছে; তাই তিনি নিজে যেমন ক্লান্ত, তাঁর প্রতিপাল্য আমরা তেম্‌নি সর্ব্বাবয়বে সাতিশয় কৃশ হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি।—

তাঁর কষ্টে চোখে জল আসিত—

অথচ এইবার তাঁহাকে জীবনব্যাপী দুর্ব্বহ দুশ্চিন্তা আর ব্যথার হাত হইতে মুক্তি দিতে পারিব, এ কথাটি মনে পড়িলেও মনটাকে শুধু স্পর্শ করিয়াই গেল ..

অগাধ অমৃত আনন্দে মনটাকে ডুবাইয়া দিতে লাগিল এই কথাটাই যে, গাড়ীর এই দোল খাইতে খাইতে যেখানে আমি চলিয়াছি সেখানে আমি স্বাধীন।—

বিদায়ের বেলায় বাবা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ

করিয়াছিলেন ; মায়ের চোখে জল ধরে নাই ; তাঁহাদের মঙ্গল-কামনা মাথায় লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম...

কিন্তু সে এক কথা, স্বাধীনতা অন্য কথা।

চিঠিতে লেখা ছিল, বয়েলগাড়ী ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবে।—

গ্রাম-সনাতন ষ্টেশনে পৌছিয়া দেখিলাম, বয়েলগাড়ী ষ্টেশনে উপস্থিত আছে।

বিছানা বিছাইয়া লইলাম।

গাড়ী চলিতে সুরু করিল।...

গাড়োয়ানের সঙ্গে আলাপ করিবার কিছু নাই। তবু চাকার কচ্‌কচি শুনিতে শুনিতে কিছু পথ অগ্রসর হইয়া প্রথম যেটা হঠাৎ মনে আসিল, পিঠে-দাদ্ লোকটাকে সেই প্রশ্নটাই করিয়া বসিলাম ; এবং তাহার পরই ছিপি খুলিয়া বাক্যস্রোত এম্‌নি সবেগে অনর্গল ঢালিয়া পড়িতে লাগিল যে, কোনো দিন যে তার অবসান হইবে এ সম্ভাবনাও রহিল না।—

জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমাদের কতক্ষণ লাগ্‌বে প্রভুরামপুরে পৌঁছুতে ?

যেন চারে মাছ হাঁ করিয়া হাজিরই ছিল, টুপ্‌ করিয়া টোপ্‌ পড়িতেই গিলিয়া ফেলিয়া হড়্‌হড়্‌ করিয়া সুতা টানিয়া ছুটিতে লাগিল,—কতক্ষণ লাগবে তাই শুদোচ্ছেন ? সে-কথা এখনই কেনে হুজুর ! সে কি এখেনে ! আপনাকে আমি বল্‌ছি শুনুন। উই যে ঝাপ্‌সা-পারা দেখ্‌ছেন, ওটা সুলতানগড় গাঁ, মোছলমানদের গড় আর গোর ওখানে অনেক আছে—যদি ইচ্ছে হয় নেমে একবার দেখে যাবেন। —যে মাঠটা আমরা পাড়ি দিচ্ছি সেটা তিন কোশ ভুঁই খুব হবে...মাঠ ছেড়েই সুলতানগড়ে উঠব...সুলতানগড়ের ভেতর দিয়ে পার্ব্বতী ঠাকুরের মঠ ডাইনে রেখে পড়্‌ব আমরা কিসুর'র মাঠে...সে মাঠ দেড় কোশ যদি না-ও হয়, পাঁচপো—

একখানা বাঙলা বই আনিয়াছিলাম, সেইখানাই খুলিয়া লইলাম। প্রভুরামপুরে পৌঁছিতে কতক্ষণ লাগিবে তাহা জানিবার আগ্রহকে বলিবার আগ্রহই ডাকিয়া দিল।—

গাড়ী আছাড় খাইয়া খাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল ; এবং যখন প্রভুরামপুরে আসিয়াছি বলিয়া গাড়োয়ান সংবাদ দিল তখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশের দিক্‌প্রান্ত স্পর্শ করিয়াছেন।—

এতক্ষণ স্বাধীনতার যে ডগমগ আনন্দে অতীতের সমস্ত দৈবনির্য্যাতন নিরানন্দ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া চলিয়া ছিলাম, অপরিচিত দুয়ারে দাঁড়াইতেই তাহা তখনই অন্তর্হিত হইয়া মায়ের মুখখানা মনে পড়িয়া গেল।—

শুধু একটিমাত্র কথা, "আয়"—

ঘুণাক্ষরেও অনুভব করিতে পারি নাই যে, মায়ের ঐ একটি "আয়" কথার প্রতি আকুল লোলুপতা আজিও আমার কত ..আজিও আমি কতবড় শিশু আর কতখানি আশ্রয় ছাড়িয়া আসিয়াছি...

চোখে জল দেখা দিল।—

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া কড়া নাড়িলাম। ভিতর হইতে গভীর কণ্ঠের প্রশ্ন আসিল,—কে ?

বলিলাম,—আমি পুলিনবিহারী রায়—

দরজা খুলিল ; এবং "আসুন" বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যিনি আমাকে বসাইলেন, পরে জানিলাম, তিনিই আমার প্রভু।—

যুগশিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে পরিচয় জন্মিল।... দেখিলাম, চোখে মুখে তাঁর যেমন একটা প্রগাঢ় নিমগ্নতা তেম্‌নি প্রশান্ত প্রসন্নতা ; বয়স ষাট হইবে, কিন্তু তাঁর দীর্ঘ সরল দেহ হইতে অনায়াস সবল স্বচ্ছন্দতা এতটুকুও ঝরিয়া যায় নাই।—

ডাকিলেন,—মা, চা নিয়ে এস।—বলিয়া তিনি সম্মুখে টেবিলে কাগজের উপর চক্ষু নত করিয়া রহিলেন ; এবং অনতিকাল পরেই যে ব্যক্তি চা লইয়া প্রবেশ করিল সে আমার দিকে চাহিয়াও দেখিল না ; কিন্তু আমার মনের

চারিপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া অপরিসীম বিস্ময় প্রভৃতি গোলমেলে মিশ্রিত ভাবের যে জোয়ার-প্লাবন অকস্মাৎ উথলিয়া উঠিল, তাহার মধ্যে আমার রুদ্ধবাক্ অন্তর কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নিমজ্জিত বিলুপ্ত হইয়া গেল।...

প্রমথনাথ যখন চোখ তুলিলেন, তখন আমি নিজেতে ফিরিয়া আসিয়াছি; কিন্তু মনে হইল, আমার মনের অবস্থা যে এম্‌নি হইবে তাহা তিনি জানিতেন; এবং জানিয়াই তিনি চক্ষু নত করিয়া রাখিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদে সঙ্কটে উত্তীর্ণ হইবার অবসর আমাকে দিয়াছেন।—

বলিলেন,—আমার কন্যা করবী। করবী, ইনি আমাদের শিক্ষায়তনের নূতন শিক্ষক, আমার বন্ধু পু...

কিন্তু তৎপূর্ব্বেই করবী প্রস্থান করিয়াছে।—

প্রমথনাথ সকৌতুকে হাসিতে লাগিলেন।...পুত্রীর পরিচয় পিতা জানেন, আমি জানি না, অনুমান করিতেও পারিতেছি না, হাসিবার এমন কোনো কারণ তাঁর থাকিতে পারে—

হয়তো লজ্জা ঢাকিতেছেন...

কিন্তু আমি মনে মনে নিজেকে কশাহত করিয়া বলিলাম —মন, তোমার এ অশিষ্টতা অমার্জ্জনীয়।...সেকেণ্ড চার পাঁচের মধ্যে কেমন তুমুল একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল!—

প্রমথনাথ বলিলেন,—আপ্‌নি শ্রান্ত, বেশী কথা আপনাকে শোনাব না, কি বলাব না। কিন্তু একটি কথা ...সেই কথাটি বল্‌তে আমি এখনই চাই।...বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর করুণ হইয়া উঠিল; খপ্‌ করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন— আপনি যত রূঢ় ব্যবহারই এখানে পান, তাতে আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না, কথা দিন্।—বলিয়া তিনি এমনি চোখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন যেন আমি অনিচ্ছুক দাতা, তিনি অসম্ভব প্রার্থী।...

সদ্যঃ মাতৃক্রোড়চ্যুত অনভিজ্ঞ নাবালক হইলেও বুঝিতে আমার বাকি রহিল না যে, কত কঠিন বন্ধনে তিনি আমাকে বাঁধিতে চাহিতেছেন; অথচ পরক্ষণেই আমি কথা দিলাম,...আমি যত রূঢ় ব্যবহারই এখানে পাই না কেন, তাহাতে ক্ষুব্ধ আমি হইব না...সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে একটু বাড়াইয়াও দিলাম,...রূঢ় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হওয়া আমার স্বভাবই নয়।

কথা দিলাম বটে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে মনের ভিতর যে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল তা আশ্চর্য্য।...শুনিয়াছি, অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতে যত ঘটনা বর্ণিত আছে মানুষ স্বপ্নজগতে একটি মুহূর্ত্তে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে!...প্রশ্ন এবং উত্তরের মাঝে যে নিমেষটা কাটিল সেই সময়টুকুর মধ্যেই, মনো-জগতে অসংখ্য প্রশ্নের আবির্ভাব আর তার খণ্ডন ঘটিয়া যে একটা দীর্ঘ তর্কের স্রোত বহিয়া গেল তাহা স্থূল পদার্থ রূপে এইরূপ দাঁড়ায়।...

এইমাত্র করবীর যে একটু তীব্র লোহিতচ্ছটা দেখিয়াছি তার সম্পূর্ণ প্রকৃত মূর্ত্তিটা হয়তো ভয়াবহই, এবং প্রমথনাথ আমার কথা চাহিতেছেন তাহারই সম্পর্কে।...উহার কন্যার ব্যবহারে রূঢ়তার পরিচয় আমি পাইয়াছি কিন্তু তাহার সম্বন্ধে দাবি বা দায়িত্ব ত' আমার নাই। সে যাই হোক্, করবীর সংশ্রবে আসিয়া যদি আমাকে রূঢ় ব্যবহার পাইতেই হয় তবে আমার কিছু আসিবে যাইবে না, অর্থাৎ লাভলোকসানে কাটাকাটি হইয়া ফাজিল কিছু না থাকিবারই সম্ভাবনা বেশী। তার পর, এটা প্রমথনাথের ধাপ্পা দিয়া ভয় দেখান' হইতেও পারে—অর্থাৎ হেঁ হেঁ, ও বড় কঠিন ঠাঁই। কিন্তু এ উদ্বেগ অনাবশ্যক...যে কন্যাকে একুশ পাক ঘুরাইতে হইবে তাহাকে আমি অবাধ লুব্ধ চক্ষে কখনো দেখিব না ইহা নিশ্চয়।...হিন্দুত্ব আমার প্রত্যেক রক্তকণায় ইত্যাদি।...

আমার আশ্বাসে বুক হইতে যেন গুরুভার উৎকণ্ঠার বোঝা নামিয়া গেল এম্‌নি আরাম পাইয়া প্রমথনাথ পুনশ্চ প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন; বলিলেন,—শুনে' বড় আনন্দিত হ'লাম। আমি কলহকে বড় ডরাই। অক্ষুণ্ণ ঐক্য আর শান্তির মাঝেই আমাদের এই সাধনা সার্থক হয়ে উঠুক্ এর চাইতে বড় কামনা আমার নেই।...যুগশিক্ষায়তনে আমার প্রিয়তম কল্পনাকে আকার দিয়েছি। কুড়িটি মাত্র ছেলে

এখানে পড়ে; মানুষ হয়ে জন্মাবার সার্থকতায় তারা পৃথিবীর আদর্শ মানুষ হ'য়ে উঠবে, এই আমার লক্ষ্য। ..

বলিয়া তিনি, নিয়মাবলী, উদ্দেশ্য, প্রণালী, পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের মুদ্রিত একখানা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে শুনাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

এই কাগজের এক "কপি" পূর্ব্বেই আমি পাইয়াছিলাম।

সুতরাং কিছুক্ষণ শুনিবার পরই আমার মনে হইল, অক্ষয় নীরবতাই কণ্ঠগুঞ্জনের উপর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে··· যেন অনাদি কাল হইতে আমি এমনই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি ..অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিব ..শব্দ থিতাইয়া পড়িয়া নীহারকণিকার মত পৃথিবীর বুকের উপর তৃণাঙ্কুরের মুখে মুখে আশ্রয় লইয়া আছে ..অপার আলস্য ভাঙ্গিয়া তাহাদের উঠিয়া আসিবার আর কোনো প্রয়োজনই নাই...

হঠাৎ তন্দ্রার আবেশ ভাঙ্গিয়া শুনিলাম, করবী বলিতেছে,—বাবা, ওঁকে ছেড়ে দাও, উনি ক্লান্ত।

চমকিয়া খাড়া হইয়া উঠিলাম, মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; এবং তাড়াতাড়ি হাতের কাগজ নামাইয়া রাখিয়া প্রমথনাথ একেবারে পাগলের মত হইয়া উঠিলেন; শত মুখে বলিতে লাগিলেন,—বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে আপনাকে অযথা বসিয়ে রেখে; আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত, বোর্ডিং কাছেই, চলুন আপনাকে...

কেবল হাত জুড়িতে তিনি বাকি রাখিলেন।

কথা ত' ঐটুকু—

কিন্তু তাহাতেই মুহূর্ত্তপূর্ব্বের তন্দ্রাগত নীরব পৃথিবী যেন সহসা জাগিয়া উঠিয়া নৃত্যলীলায়িত গীতি ও গুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠিল।...আমি এক সঙ্গেই অপ্রস্তুতে পড়িয়া গেলাম, এবং কৃতার্থ হইয়া উঠিলাম ..এবং তাহার সঙ্গে ইহাও কেমন করিয়া অনুভব করিলাম যে, করবীর মুখের কথা তার মনেরই কথা, কথার ফল আমাতে কেমন করিয়া প্রকাশ পায় ছল করিয়া তাহা দেখিতে সে আসে নাই।—

শিক্ষকতা সুরু করিয়া দিলাম।

কুড়িটি ছাত্র, সবাই অল্পবয়সী। তাদের আদর্শ মানব করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষা দিবার প্রণালীটা হাতে কলমে বুঝিয়া লইতেই আমার প্রথম দিনটা গেল।... দিনান্তে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলাম, যুগায়তনের কাছে আমার একটাকা কয়েক আনা কয়েক পাই পারিশ্রমিক পাওনা হইল!...

সব দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়ে আমার তাক্ লাগিয়া গেল; কতদূর ভবিষ্যত পর্য্যন্ত যে নখদর্পণে দেখিয়া প্রমথনাথ শিক্ষাদানের আয়োজন করিয়াছেন তাহা আমাদের কল্পনাতেও আসে না।···ইহাকে স্বপ্নবিলাসীর মনের বুদ্বুদই বোধ হয় মনে করিতাম যদি আমার আর্থিক স্বার্থ ইহার সঙ্গে জড়িত না থাকিত।···হয়তো তাঁহার এ আয়োজন ব্যর্থই হইবে...ভাবিলাম, আজকাল আমাদের মানুষ হইবার দিকে ব্যর্থ প্রয়াসেরই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হইয়াছে।—দল বাঁধা ঢের হইয়াছে, এখন যা কর নিজে নিজে। ..

দেখিলাম, বয়নশিল্পী হইতে সুরু করিয়া নৌশিল্পী পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত। তাহাদের সবাই দেখিতে শুনিতে ভাল; কেবল একজন শিক্ষককে দেখিয়া বমনোদ্বেগে আমার পেটের নাড়ী মুচড়াইয়া উঠিল।··· ভদ্রলোকের একটু কুঁজ আছে, চোখ ট্যারা আর কটা, সামনের একটা দাঁত নাই...মুখের অবয়বে এবং চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা নিষ্ঠুর কর্কশতা বিরাজ করিতেছে যাহাকে বিধাতার আনন্দদান বলিয়া ভুল করিবার উপায় নাই। ..বয়স প্রায় ত্রিশ, অমন বলিষ্ঠ আকৃতি প্রায় দেখা

যায় না...গালের মাংস স্থূল আর লাল; চোখ অতিশয় কোটরে, যেন চতুর্দ্দিকে দুরতিক্রম্য প্রাচীর তুলিয়া দিয়া তাহারা লুকাইয়া আছে।...

তিনি আলাপ করিলেন,—শুনেছি, আপনার নাম পুলিন; এই আপনার চাকরীর সুরু; কিন্তু এখানে কেন? এখানে সুখ বলে' জিনিষটা পাবেন না; উপোস করার অভ্যাস আছে? না থাকে ত' এই বেলা...

বলিয়া চোখ ঠারিয়া তুড়ি বাজাইয়া দিলেন।

আমি একটু হাসিলাম, যেন এই সহানুভূতি আমি সহানুভূতির মতই গ্রহণ করিয়াছি।—

প্রমথনাথ বলিলেন,—কিন্তু তার কি কোনোই পুরস্কার নেই?

—আছে না কি? কি সেটা?

—আমার এই প্রবুদ্ধ ইচ্ছাকে সার্থকতা দে'য়া। তা' ছাড়া, সর্ব্বদাই এই শিশুদের সংস্পর্শে থাকা মস্ত একটা লাভ, পুরাতনের আব্‌হাওয়া প'ড়ে নিজের মন শুষ্ক জীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌তে পায় না; ছেলেদের—

—আপনি গেঁজেল, আর তারা লক্ষ্মীছাড়ার দল।

প্রমথনাথ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—আপ্‌নি অকারণে রাগ করছেন, রাজেন্দ্রবাবু—

কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না; তেম্‌নি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—তাদের সবগুলোকে এক গাদায় ফেলে পুড়িয়ে ছাই ক'র্‌তে পায়লে তবেই পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়।—

শুনিয়া প্রমথনাথের কোন্ ভাবটা প্রবল হইয়া উঠিল তাহা বোঝা গেল না।...এক সঙ্গে এতগুলি ছেলের কাষ্ঠাগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় পৃথিবী ঠাণ্ডা হইবে কি না সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও তার সম্ভাবনাটা মানুষের ভাল লাগিবার কথা নয়; এবং অতবড় নরমেধযজ্ঞ যে অবলীলাক্রমে করিতে চায় তাহার প্রতি তাঁর প্রসন্ন হইয়া না ওঠা বিচিত্র নয়; তারপর, উপরওয়ালার প্রতি অত তীব্র উক্তিরও কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ত থাকাটাই আশ্চর্য্য।...

প্রমথনাথ লাল হইয়া উঠিলেন।—

এবং আমাকে সেই অপ্রিয় কথোপকথনের ভিতর হইতে টানিয়া বাহিরে আনিতেই তিনি সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন।...লক্ষ্য করিলাম, তাঁর আঙুলগুলি কাঁপিতেছে... বলিলেন,—রাজেনবাবু, বসুন, আমরা একটু ঘুরে' আসি।—

রাজেনবাবু পর্ব্বতের মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, আমরা ঘুরিয়া আসিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

জীবনের এক অধ্যায় এমনি ভাবে আরম্ভ হইল।

প্রমথনাথ ধীরবুদ্ধি কাজের লোক; যেমন শান্ত তেম্‌নি সহিষ্ণু, তেম্‌নি ক্ষমাশীল, তেম্‌নি বিদ্বান্, ..অবাক্ হইয়া যাই যে, জ্ঞানের এত সংগ্রহ তিনি মস্তিষ্কের কোথায় সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, আর কেমন করিয়া কি কৌশলে তাহা সরল সুন্দর হইয়া স্তর খুলিয়া নিরন্তর বাহির হইয়া আসে!...চারিদিককার সুনিয়মিত শৃঙ্খলা আর নিঃশব্দ কর্ম্মধারার মধ্যে বিকার ঐ রাজেন্দ্রবাবু।

তাঁহার হুঙ্কারে ছেলেরা মৃতপ্রায়, তাঁহার ব্যবহারে প্রমথনাথ ব্যথিত ও লজ্জিত, আমি বিবিধভাবের সমাবেশে উৎপীড়িত।—

কিন্তু যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্য এই যে, ভাবিয়া বুঝিতেই পারি না, কি করিয়া প্রমথনাথ অধস্তন এবং পুত্রের বয়সী এই শিক্ষকের দুর্ব্যবহার, অক্লেশে নয়, অকুতোভয়ে নয়, অপ্রতিকারে সহ্য করিয়া আসিতেছেন—অথচ প্রতিকার তাঁর নিজের হাতে!...এই লোকটির যত আক্রোশ যেন তাঁহারই উপর।...বোমা তাঁহারই বুকে পড়িয়া ফাটে, আমরা শুনি শব্দটা, আর পাই তার স্ফুলিঙ্গ।...কঠিন ব্যথায় বিদ্ধ হইয়া বৃদ্ধের মুখের রং শাদা হইয়া যায়.. অপমানে চোখের জল পড় পড় হয়.—

বৃদ্ধের এই নিরীহ নির্জ্জীবতাকে দৌর্ব্বল্য মনে করিয়া তাঁহার উপর রাগও হয়...এত ভালমানুষী অসারতার

পরিচয়, আর অপরাধ। আবার মমতাও জন্মে—খাসা লোক, অথচ এমনি দূরদৃষ্ট যে—

কিন্তু হঠাৎ একদিন সন্দেহ দেখা দিল।

সন্দেহটাকে সহজে অতিক্রম করিয়া যাইতেও পারিলাম না।...যাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলিয়া খুন চাপিয়া যায়, তেমনি আচরণ উনি বসিয়া বসিয়া কেবলি সহ্য করিতেছেন যে কারণে তাহা গভীর না হইয়া যায় না।... আদর্শ মানুষ প্রস্তুতের যে কারখানা প্রমথনাথ খুলিয়া বসিয়াছেন তাহা ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় আপাততঃ ঐ রাজেন্দ্রনাথ...তাহারই দৌরাত্ম্যে ছেলে পালাইয়া কুড়িটিতে দাঁড়াইয়াছে···ঘরে বাহিরে সে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া রাখিয়াছে...যদি গুপ্ত কারণই না থাকিবে তবে অত সহ্য করিবার প্রয়োজন!...বর্ণবোধ আর শিশুশিক্ষা পড়াইতে আরো অনেককে জানে।—

রাজেন্দ্রের সম্পর্কে আমি অক্ষয় সংযম দেখাইব, সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। প্রমথনাথ বিশদ করিয়া না বলিলেও রাজেন্দ্রকে স্মরণ করিয়াই তিনি যে আমাকে বাক্‌দত্ত করিয়া লইয়াছিলেন তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। রাজেন্দ্রের সঙ্গে আমার অন্তত বাহ্যিক একটা শান্তির ভাব অটুট থাকিবে ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা জানিয়া তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা আমার হয় নাই।... কিন্তু এই শান্তির ভাব বজায় রাখিবার প্রধান উপায় তাহাকে পরিহার করিয়া চলা; তার মুখভঙ্গী, ইতর কথা আর অকারণ তর্জ্জন গায়ে না মাখা।—

রাজেন্দ্রনাথের আলাপ আর যা-ই হোক্ মধুর নয়—

কিন্তু হঠাৎ একদিন আমাকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া এমন আলাপ জুড়িয়া দিল যাহাতে আমার আধ্যাত্মিক সঙ্কট বাড়িল বই কমিল না···নিজের কীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দিয়া সে জানিতে চাহিল, যৌবনের সুখ আমি কত প্রকারে আস্বাদন করিয়াছি!—

উত্তর না পাইয়া ধাঁ করিয়া সে মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল, তারপর সে যে-কাণ্ড করিল, তাহা আদর্শ মানুষ প্রস্তুত করিবার কারখানার যারা মিস্ত্রী নয় তাহাদেরও অনুকরণীয় নহে।—

অতি রমণীয় যে ছবিটি প্রথম দিন আমার চোখের সাম্‌নে আকাশে বাতাসে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, এই সবের অন্তরাল ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া সে মাঝে মাঝে সম্মুখে দাঁড়াইত।...আমার হাসিও পাইত—

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" শুনিয়া ক্লান্ত নবকুমার মেদিনীপুরের বালিয়াড়ির উপর যেমন একটা নূতন জগতের কলরোল শুনিয়া চম্‌কিয়া উঠিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, আমারও তেমনি ঘটিয়াছিল, কিন্তু চেয়ারে এবং তন্দ্রার তরলতার তটপ্রান্তে বসিয়া।...

সে যা-ই হোক কাব্যসৃষ্টি আমার এ গল্পের উদ্দেশ্য নয়।—

চেষ্টা না করিলেও নজরে পড়িয়া গেল যে, রাজেন্দ্রের নামে কখনো চিঠি আসে না।—পৃথিবীতে এমন নির্ব্বান্ধব কে আছে যাহাকে চিঠি লিখিবার লোক নাই!—রাজেন্দ্র একেবারে কুণো, ঘরের বাহিরে আসিতে চায় না; বলে, ফুটবল খেলিতে একবার হাঁটু জখম হইয়াছিল; সেই স্থানটা খুঁতো দুর্ব্বল হইয়াছে, বাতের আক্রমণ ঐ স্থান হইতেই হইবে।...

যেন পাতা উল্টাইয়া নূতন নূতন চিত্র আমার চোখে পড়িতে লাগিল।...

দুর্ব্বৃত্ত ছাড়া আর কোনো আখ্যা রাজেন্দ্রকে দেওয়া যায় না; ঐ দুর্ব্বৃত্তের প্রতি প্রমথনাথের স্বাভাবিক একটা সাহায্যের ভাব দেখি...উভয়ের মধ্যে একটা বন্ধন আছেই এবং হৃদ্যতার ফল্গুস্রোত চলিয়াছে,—তাহা স্বচক্ষে বহুবার দেখিয়াছি...দুইজনে ফিস্‌ফিস্ কথা হয়, হাসাহাসিও হয়, তাহাও না দেখিয়া পারি নাই।...এই গুপ্ত সদালাপ কি

পরামর্শ যাহাই হউক তাহা কি শুধু শিক্ষায়তন সম্পর্কীয় ? দানবটা তাহার কি বোঝে ?...

ভিতরে নিশ্চয়ই কথা আছে—

গুরুতর পারিবারিক কলঙ্ক কি অতিশয় ঘৃণ্য পাপানুষ্ঠান ইহার মূলে আছে ; অথবা, বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া কি জালিয়াতি করিয়া প্রমথনাথ এই বিপুল ধন লাভ করিয়াছেন—

তার সাক্ষী আর সহায় ঐ ষণ্ডটা।—

...তাই এই চরম দুর্ম্মুখ নিষ্ঠুরতা আর পরম সহিষ্ণু ক্ষমা হাতে হাতে মিলাইয়া বেড়াইতেছে।—

কিন্তু আমার এ সন্দেহ অমূলক, এবং সেই সংবাদটি যে দিন পাইলাম সে দিন এমন আরাম পাইলাম যেন টন্‌টনে ফোঁড়া ফাটিয়া একরাশ পুঁযরক্ত বাহির হইয়া গেল :—

আমি বোধ করি বয়সদোষেই একটু গোয়েন্দাগিরি করিতে চাহিয়াছিলাম ..ব্যাপারের গোড়ায় পৌছিতেই হইবে। কিন্তু ঐ বয়সদোষেই সেটা লুকাইয়া রাখিতে পারি নাই—

লক্ষ্য রাখার রকমে, নির্ব্বোধের মত প্রশ্নে আমার গোয়েন্দাগিরি অল্প দিনেই দুজনেরই চক্ষে ধরা পড়িয়া গেল।...প্রমথনাথ কেবল সকাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন...রাজেন্দ্র দাঁত মেলিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল।—

যে ঘরে প্রথমদিন চা খাইয়াছিলাম, সেই ঘরে আমার ডাক পড়িল, এবং ঢুকিয়া দেখিলাম, পিতা প্রমথনাথ এবং পুত্রী করবী অতিশয় দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া বসিয়া আছেন।

বসিলে প্রমথনাথ বলিলেন,—আপনার ব্যবহারে আমি বড় খুশী হয়েছি, আর আপনার ধৈর্য্যগুণে। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষকগণ আমাকে রক্ষা করতে গিয়েই নিজের উপর নির্য্যাতন টেনে নিয়েছেন ; ফলে চাক্‌রী ছেড়ে তাঁদের চলে যেতে হয়েছে। আর্ত্তরক্ষার প্রবৃত্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই ; আপনাতেও সে প্রবৃত্তি মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছে দেখেছি ; আপনার আত্মসম্বরণের ক্ষমতা...

শান্তকণ্ঠে তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

আমি সোজা তাঁহার দিকে চাহিয়া তাঁহার কথাগুলি কর্ণে গ্রহণ করিতে লাগিলাম, অর্থও বোধগম্য হইতে লাগিল, কিন্তু মনের অন্তস্তলে একটা চাঞ্চল্য যেন টগবগ্ করিতে লাগিল—করবী কোন্‌দিকে চাহিয়া আছে কে জানে!...

প্রমথনাথ বলিতে লাগিলেন,—শিক্ষকতায় আপনার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে, সবারই তা থাকে না, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাকে আমার আর দরকার নেই।—

সংবাদটা দুঃসংবাদ বটে ; পাঁচ সাত জোড়া জুতা ছিঁড়িবার পর চাক্‌রীটি মিলিয়াছিল ; কিন্তু কেমন করিয়া যেন অবশ্যম্ভাবী দুরদৃষ্টের শঙ্কা কাটিয়া ভিতরে ভিতরে আমি প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিলাম ; কাজেই, একেবারে ধরাশায়ী না হইয়া চাকা খুলিয়া কাৎ হইয়া পড়িলাম।

—রাজেনবাবুর খাতিরে বুঝি ?—প্রত্যুত্তরে ঐ প্রশ্নটি রসনাগ্রে ছুটিয়া আসিল ; কিন্তু উচ্চারণ না করিয়া নিঃশব্দ রহিলাম।

—আমাকে আপনি মার্জ্জনা করবেন।—বলিয়া প্রমথনাথ অতীব কুণ্ঠিতভাবে তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহারই মুখখানা ছাড়া আর কোনদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিতে পারিলাম না।...মনে হইতে লাগিল, যেন এই অকস্মাৎ বহিষ্করণের সমস্ত অপরাধ আমার, এবং অদূরবর্ত্তিনী ঐ রূপশিখার সম্মুখে আমি অত্যন্ত অপদার্থ কুৎসিত একটা প্রাণীতে পরিণত হইয়া গিয়াছি।...

প্রমথনাথের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়াই রহিলাম—

তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন,—যতদিন আর একটি জোগাড় না হয়ে ওঠে ততদিন আপনি এখানে থাকবেন। আপনি অভাবী তা আমি জানি :—

এবার আমার রাগ হইল।—আমি অভাবী তাহাতে আপনার কি মহাশয়?

কণ্ঠস্বর কটু করিয়াই বলিলাম,—যে আজ্ঞে; কিন্তু আমার অপরাধ কি? কি অপরাধে—বলিতে বলিতে দুর্ব্বল হৃদয় হঠাৎ এক ঝলক জল উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল।

করবী উঠিয়া গেল—

তার খোঁপার চিরুণীর পীত আভা আমার চোখের জলবিন্দুতে বুঝি বিম্বিত হইল।—

প্রমথনাথ হঠ্ করিয়াই কিছু বলিলেন না; যখন বলিলেন তখন আমার অপরাধের তালিকা দিলেন না, বলিলেন,—যা বলেছি তাই আমার শেষ কথা। শিক্ষক হিসাবে অপরাধ অপ্‌নার নেই।—

বোর্ডিং-এ আসিতে আসিতে অভিসম্পাৎ দিলাম—

গরীবের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্র ভগবান সহ্য করিবেন না।... এ স্থানে আর নয়...খালি ভণ্ডামি আর ভণ্ডামি।... বুড়ো ঘুঘু কোথাকার!

বাক্স বিছানা লইয়া সেইদিনই চলিয়া আসিব—

প্রমথনাথ প্রথম রাগের মাথায় এই সঙ্কল্প খুব জোর করিতে থাকিলেও, যথাকালে "যথা-লাভের" সুবুদ্ধিটার উদয় হইল।...যে ক' দিন রাখে থাকিয়া যাই।—

প্রকারান্তরে অর্দ্ধচন্দ্র খাইবার পর আরো দুদিন গেল। তৃতীয় দিন শুক্লাষ্টমী, অর্দ্ধচন্দ্রের তেমন জোর নাই।

কিন্তু ঐ অব্‌ছায়া আলোতেই আমার স্পষ্ট লক্ষ্য হইল। রাজেন্দ্রনাথের থাকিবার ঘরটার কোল-আঁধারের ভিতর দিয়া কে যেন গুটি গুটি চলিয়াছে—

বোর্ডিং-এর আমার জানালা হইতে তাহাকে শুধু গুঁড়ি মারিতেই দেখিলাম; কিন্তু আর কি করে দেখা যাক্ ভাবিয়া বিলম্ব করিবার ধৈর্য্য রহিল না।...কে কে? করিয়া দুইবার সাড়া দিতেই লোকটা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল...

ইস্কুলটা উচ্চ প্রাচীরের ভিতর—

প্রকাণ্ড হাতার মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেকেলে গাছ; প্রকৃতি আর মানুষের রুচি এই দুটিতে মিলিয়া স্থানটিকে সাজাইয়াছে ভাল।

লোকটা ময়দান পার হইয়া ক্রোটনকুঞ্জের মাথা আর প্রাচীর ডিঙাইয়া চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল, কর্ত্তব্য বিবেচনায় প্রমথনাথকে খবর দিতে অগ্রসর হইলাম।—

চোর আসিয়া অল্পরাত্রে, যখন কেহ ঘুমায় না তখনই চুরির অবসর খুঁজিতেছিল, এ সংবাদে চোরের দুঃসাহসে বিস্মিত হওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো ভাবান্তর হওয়া বোধ হয় স্বাভাবিক নয়; কিন্তু প্রমথনাথ ভয় পাইয়া একেবারে আলুথালু হইয়া উঠিলেন...যেন তাঁর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের এই সূত্রপাত।...

চোর আসিয়াছিল...

মানুষের সাড়া পাইয়া কে নক্ষত্রবেগে খানিকটা উঠিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া পলায়ন করিয়াছে, ইহা এমনই কি ভয়ের কথা যে তাই শুনিয়া প্রমথনাথ গা হাত পা কাঁপিয়া একেবারে যায় যায় হইয়া উঠিলেন।...বাহিরে তাঁর বার্দ্ধক্যের লক্ষণ কিছু ফোটে নাই কিন্তু ভেতরটা ঘুণে খাইয়াছে; নতুবা সামান্য চোরের কথায় সবলচিত্তের মানুষ খাবি খায় না।..

করবী আসিল...

আসাটা দেখিলাম—নিঃশব্দে পা পড়িতে লাগিল... নখরের শুভ্রতা, পদতলের কোমলতা, চরণের স্বর্ণচ্ছটা, কঙ্কণের জ্যোতিঃবিচ্ছুরণ, রক্তোষ্ঠ, তুলির লিখন ভুরু দুটি, মুখের উৎকণ্ঠা, চোখের ম্লানিমা, ললাটের মসৃণতা

...সবগুলি একত্রে এক নিমেষে চোখে পড়িয়া গেল।--

প্রমথনাথের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া সে বলিল,—কি হয়েছে, বাবা?

কিন্তু প্রমথনাথ তখন যেন সর্পবিষের ক্রিয়ায় নীল আর নিস্তেজ।

আমিই ঘটনাটা বলিলাম—

করবী আমার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল, এবং শুনিবার পর তার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল।...

প্রমথনাথ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—কি বল্‌ছিলি, করি?

কিন্তু করবী তখন চলিয়া গেছে।

আমি বলিলাম,—পুলিশে একটা খবর দিয়ে রাখা ভাল। সাইকেলে—

যেন তাঁহাকে মারিতে উঠিয়াছি, এমনি তাড়াতাড়ি তিনি আচ্ছন্ন ভাবটা ঠেলিয়া হাত তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, না না, দরকার নেই; পুলিশ টুলিশে খবর দিয়ে দরকার নেই।—আপনি এখন যেতে পারেন। করবী মা, আমায় একটু জল দাও।...

বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া আমি উঠিয়া আসিলাম –

কোটরই বলুন, কুটিরই বলুন আর কবরই বলুন—আমার ছোট্ট ঘরখানাকে ঐ আখ্যার যে কোনো একটা দিলেই চলে। কিন্তু এটা আমার আক্রোশের কথা। পরে ভাবিয়া দেখিয়াছি, ঘরটা ভালই ছিল।

রাত্রি প্রায় এগারটা –

কোটরস্থ শয্যায় পড়িয়া অনেক কথাই ভাবিতেছি—আমার গোয়েন্দাগিরিতে ক্ষুণ্ণ রুষ্ট প্রভৃতির একটা কিছু হইয়া প্রমথনাথ আমাকে বিতাড়িত করিতেছেন; ভালই; খোদা তাঁর ভাল করুন।...মায়ের কাছে যাইব···খাওয়া দাওয়ার কষ্টে শরীর যাচ্ছেতাই হইয়া গিয়াছে...পঞ্চাশ টাকা আমার যেখানে সেখানে মিলিবে; একেবারে গর্দ্দভ ত' নই...পঞ্চাশটা টাকা হাতে আছে...ফুরাইতে ফুরাইতেই একটা কিছু মিলিয়া যাইবেই।···যদি শুধু কথাটা জানিতে পারিতাম তবে না জানি এ দুজনার ভিতরকার বিরূপ মূর্ত্তি আমার চোখে পড়িত।—দু'জনাই পাষণ্ড···বোধ হয় নোট জালের কারখানা আছে···রাজেন্দ্র ওস্তাদ, সে-ই কর্ত্তা; প্রমথনাথ সচিব মাত্র...নতুবা এই বিজন প্রদেশে আসিয়া সহস্র অসুবিধার মধ্যে যুগশিক্ষায়তন স্থাপনার উদ্দেশ্য কি।···আর ছিঁচকে চোরের কথায় অত ভয়ই বা কেন।...

করবীর কথাটাও মনে আসিল –

নামটি বেশ; করবী পৃথিবীর ব্যথার প্রতীক...রূপ অনির্ব্বচনীয়।...বিবাহের সময় যখন কনে' দেখিতে বাড়ীর কেহ যাইবে, বোধ হয় মেজ্‌দাই যাইবেন, তখন তাঁহার সঙ্গে অমূল্যকে কি সুবোধকে পাঠাইব; আর জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া কনে'কে করবীর সঙ্গে মিলাইয়া লইব।—তবে, করবীর মত—

হঠাৎ করবীরই আর্ত্তনাদে আমার বিবাহসম্পর্কীয় অকালধ্যান ভাঙ্গিয়া মিলাইয়া গেল...বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম; জানালা দিয়া দেখা গেল, প্রমথনাথের ঘরের লাল পর্দ্দা দীপালোকে জ্বলিতেছে...অনেকগুলি ছায়াও যেন দেয়ালে বিচরণ করিতেছে।

আর্ত্তরক্ষার উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে যাইয়া যখন দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিলাম তখন কি বা কে সর্ব্বাগ্রে আমার চোখে পড়িল তাহা আজ মনে করিতে পারিতেছি না।...যেন ধাঁধায় পড়িয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম; দেখিলাম, করবী দেয়ালে মুখ চাপিয়া ফুঁপাইতেছে; প্রমথনাথ চোখ বুজিয়া চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া আছেন; তিনি জীবিত কি মৃত বুঝিবার উপায় নাই; রাজেন্দ্রনাথের হাতে হাতকড়া, আর ঘরের ভিতর একঘর পুলিশ।—

আমি থম্‌কিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম—

প্রমথনাথ মৃতবৎ অসাড় অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন, করবী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল ..

আসিবার সময় পুলিশ নিঃশব্দে আসিয়াছিল—

যাইবার সময় কচমচ করিয়া বুট বাজাইয়া চলিয়া গেল; স্বয়ং ইন্‌স্পেক্টরের জিম্মায় রাজেন্দ্রনাথ তাহাদের সঙ্গে গেলেন।

কিন্তু আমার একবারও মনে পড়িল না যে, আর কিছু নয়, নোট-জালের ষড়যন্ত্রই ধরা পড়িয়াছে।

—চলে' গেছে?—বলিয়া প্রমথনাথ যখন চোখ খুলিলেন তখন মনে হইল, তাঁহার চোখ দিয়া জলের বদলে রক্ত টপ্ টপ্ করিয়া এখনই পড়িবে।

করবী টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

প্রমথনাথ হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে আমাকে বসিতে বলিলেন।...আমার মুখে আর কথাটি ছিল না; নিঃশব্দে বসিলাম। প্রমথনাথের আশ্চর্য্য আত্মসম্বরণের শক্তি; প্রথম কথাই তিনি বলিলেন,—আপনি এখানেই থাকবেন; চাকরি আপনার রইল।

বলিলাম,—যে আজ্ঞে।

—কিন্তু যাকে ওরা নিয়ে গেল, সে কে জানেন?—আমার পুত্র—

—আপনার ছেলে?—বলিয়া বিহ্বলের মত শুধু হাঁ করিয়া রহিলাম।

—আমার নাম ক্ষিতিনাথ, ওর নাম প্রভাকর; আমরা ব্রাহ্মণ নই, কায়স্থ।...কিন্তু কাউকে আমি অপরাধী করি নে। আমার সকল যন্ত্রণা তাঁরি দান; পুত্রও তাঁরি দেওয়া।

খানিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—হাঁ, আমারই পুত্র... এত যন্ত্রণা গ্রহণ করবার স্থান আমার এতটুকু বুকের কোথায় আছে জানি নে।...আচ্ছা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে।

আমি উঠিলাম।

প্রমথনাথ পুনরায় বলিলেন,—কেন ওকে ধ'রে নিয়ে গেল শুনে যান্।...খুনী আসামী, জেল ভেঙ্গে পালিয়ে ছিল। আপনি যাকে চোর ভেবেছিলেন সে পুলিশের চর।—*

* ইংরেজী হইতে

———

দুঃখবিবাদী

শ্রীধনঞ্জয় শর্ম্মা

দুখী-বৈরাগী আখ্‌ড়া খুলেছে শ্মশানঘাটের ধারে—
জঙ্গলে-ভরা মরা সুঁতিটার মোহানার আড়পারে।
কয়দিন হ'তে দেখি যে আবার, তুলি' মহা হাঁকডাক
দিন রাত নাই কেবলই বাজায় দুঃখের জয়ঢাক ;
পল্লীর যত বীণা আর বাঁশী—কানা করি' সবগুলি
দুখ্‌ দুখ্‌ দুখ্‌ দুদুখ্‌ দুদুখ্‌ কপচায় নব বুলি।
শুধু তাই নয়, হেঁকে সবে কয়, মহা উৎসাহে মাতি'
জগতের লোক, চলে' আয় হেথা নিবিয়ে সুখের বাতি ;
মিথ্যা প্রকৃতি মিছে আনন্দ—কহি' সত্যের ভানে,
দুই হাত দিয়ে যাত্রীজনের পোঁটলা ধরিয়া টানে ;
প্রকৃতি যদি সে মিথ্যাই হ'ত, আনন্দ যদি মিছে,
কার ইঙ্গিত বহিছে প্রমাণ এই প্রচারের পিছে ?
কুহু কুহু করি' কোকিল যে ডাকে চৈত্র-নিশীথরাতে,
হোক্ কুহুকুহু, তবু মুহুমুহু সুখেরই প্রকাশ তাতে।

ছবি ও ছন্দ গীতি ও গন্ধ, তুলে' দে রে কারবার,
আকাশ বাতাস ফুল পিক অলি, সাবধান এই বার ;
তোদের দফাটি শেষ করিবারে দুঃখের রঙে দাগী—
নবরূপে আজি উদিল মর্ত্ত্যে দুখবাদী বৈরাগী।
কল্‌কির হাতে অসি আছে শুনি, ইহাদের হাতে মসী,
তাই লেপি' এরা কালো করে' দেবে ধরণীর রবি শশী।
মলয়ভক্ত ওরে মূঢ়দল, পালা রে পাতাল ফুঁড়ে',
নতুবা এখনি মন্ত্রের ঝড়ে উড়িবে তোদের কুঁড়ে ;
কে যে মরেছিল বাজ পড়ে' কবে শুনিস্ নি তা কি কানে—
মনুর বংশ তবু ফিরে চাস্ নবঘনশ্যামপানে।

এখনো মোদের আখ্ড়াতে আয়, ওরে মূর্খের দল,
হাতে হাতে ফল পেয়ে যে তোদের চক্ষে ঝরিবে জল।
সৌন্দর্য্যের পূজারী হইতে চাহিবি না একেবারে—
কেবা সুন্দর কেবা কুৎসিত মোদের অন্ধকারে।

এই বিশ্বের প্রকৃতি হইতে কিছু নাই শিখিবার।
তরুর মতন সহিষ্ণুতা, সে—কেবলি কথার মার,
মাটির মতন ধৈর্য্য এবং বিনয় তৃণের মত—
অগ্নিতে তেজ সলিলে শান্তি—পাগলের কথা যত।
পক্ষীর মাঝে চটকই রয়েছে, বাকি আর কিছু নাই,
আর তার কাছে ঐ কাজটাই শুধু শিখে' নেওয়া চাই।
চক্রবাকের প্রেমের কাহিনী—কবির মিথ্যা বাণী,
শ্বাপদ ভিন্ন নাহিক' অন্য অহিংস্র কোনো প্রাণী।
কুসুমের দোষ শুধু পড়ে চোখে, ভুলি গন্ধের দান,
রাঙা সন্ধ্যায় মন্দিরে শুধু বিলাসীরই অভিযান।
উপমাটি ভালো, তবু সে খাতিরে রহিয়া সত্যাধীন,
মক্ষিবৃত্তি হ'তে নারি হয়ে ষটপদে উদাসীন।
এ ব্রহ্মাণ্ডে মাকালই দেখিছ, অন্য অমৃত নাই।
কর্ম্মের বলে ভাগ্যের ফলে, যার যাহা জোটে তাই।

হায় কবি হায়! এমনি করিয়া মিথ্যার ঠুলি পরি'
ভরা দুপুরেতে ঘনায়ে তুলিছ তমিস্রা শর্ব্বরী।
দিনও যেমন রাত্রিও তাই, সমান আঁধার আলো,
দুই আছে বলে' সুখে ও দুঃখে জগতে বেসেছি ভালো;
হাল্কা বলিয়া ফুৎকারে তব উড়াতে চেয়ো না সুখে,
আছে বলে' জীবনতৃষ্ণা জাগে তাই বুকে বুকে।
সুখ আছে বলে' সার্থক দুখ, সুখ আছে বলে' আছি,
মরণপন্থী সেও বলে তাই—মরিতে পারিলে বাঁচি।
মোটের উপর সুখের মাত্রা বেশী না রহিত যদি,

কোথা হ'তে এই কাব্যের স্রোত কল্লোলে নিরবধি ?
অবিচারে মেঘ ঢালিলে বর্ষা কোথায় থাকিত তুমি ?
কোথা থাকিত এ সুখের দুঃখ কোথা বা থাকিতে তুমি ?
বুদ্ধের নাম লইও না আর মিথ্যার ইতিহাসে,
দুঃখ দূরের তথ্যে তাঁহারি সুখেরই সাক্ষ্য হাসে।

অলীক কথায় মনে পড়ে' যায় সে কালের সেই গল্প,
অল্প আকার কিন্তু যাহার তত্ত্বটি নয় অল্প।
বিশ্বের এই চিরসুন্দর শ্যাম অরণ্য মাঝে,
শুষ্ক কাষ্ঠে দুঃখবাদীর শুষ্ক কণ্ঠ বাজে।
খট্ খট্ খট্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ কহিতেছে কাঠ্ঠোক্রা ;
সৃষ্টি-তরুতে কোনও রস নাই নিঃসার সে যে ফোঁপ্রা।
মহা অরণ্য তথাপি তাহারই যোগায় খাদ্য জল,
মায়ের মতন চির ক্ষমাশীল চাহি তারই মঙ্গল।
ধরণী কেবলই ধূলাবালিময় শুষ্ক নীরস ওঁচা,
খচ্ খচ্ খচ্ চঞ্চু বিঁধিয়া কাঁদিতেছে কাদাখোঁচা ;
তথাপি ধরণী জননীরই স্নেহে পালিয়া শস্যেজলে,
হাসিয়া উড়ায় সে মূঢ় প্রলাপ স্নেহেরই করুণাবলে।
বাড়ে তাহাদেরই সন্তান দল—সুখেরই প্রমাণ খাসা।
আহা, বেঁচে থাক্ তবুও বাছারা মোরি বুকে বাঁধি বাসা।

দীপক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

(১)

বাঙলার বাহিরের এই নগরটির নাম দীপক ভুগোলেও পড়িয়াছে। কি কি জিনিষের জন্য এই নগরটি প্রসিদ্ধ তাহাও সে জানিত। কিন্তু এই বিশাল নগরীতে আজ পদার্পণ করিয়া প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল, জীর্ণ, অপরিষ্কৃত অপরিসর নর্দামাগুলি। একটা তীব্র দুর্গন্ধ বাতাসকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তারপর দেখিল, এক প্রকারের নূতন অশ্বযান্। ঘোড়াগুলি কোনও মতে তাহাদের বংশ ও সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কায়ক্লেশে গাড়ীগুলি টানিতেছে। গাড়ীগুলি দুই চাকার—নাম একৃকা। জিনিষপত্র অনেক ছিল বলিয়া দীপকের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও একৃকায় যাওয়া হইল না। ঘোড়ার গাড়ীতেই যাইতে হইল।

প্রথম দিনই আর বোর্ডিং-এ যাওয়া হইল না। তাহাদেরই এক প্রবাসী আত্মীয়ের বাড়ীতে তাহার দাদা ও দীপক গিয়া সেদিনের মত উঠিল। আত্মীয়টি ব্যারিষ্টার। বয়স হইয়াছে, স্থূলকায় গোলগাল মুখখানির উপরে একটি গড়ুড়ের মত নাক তাঁহার চেহারায় বিশিষ্টতা দিয়াছে। লোকটি ভাল। যাহাই রোজগার করুন, বাড়ীতে অনেকগুলি পোষ্য। নিজেরই প্রায় এগারটি। এ ছাড়া ত আত্মীয়বর্গ আছেই।

দীপক যাইতেই সাহেবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হইল। দীপক এর পূর্ব্বে কখনও ব্যারিষ্টার বাঙালী সাহেব দেখে নাই। তাই সাক্ষাতের পর বাহিরে আসিতেই সে তাহার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মেজদা, ব্যারিষ্টার সাহেবরাও গেঞ্জি পরে থাকে? তাও আবার ফুটো!

তার পরেই একেবারে বাড়ীর ভিতর চালান। শুধু মেয়ে আর মেয়ে। ছোট বড় মাঝারি বয়সের, কচি কাঁচা সব মিলিয়া অনেকগুলি। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। হল্ ঘরের ভিতরটা একটু অন্ধকার—মেয়েদের অনেকেরই মুখ তাই ভাল করিয়া দেখা গেল না।

হল্ ঘরটি সাজান। কৌচ্-কেদারার ওয়াড়গুলি বিলাতি ছিটের কাপড়ের—স্থানে স্থানে ব্যবহারে ছেঁড়া, রঙ উঠিয়া গিয়াছে। এক পাশে একটি পিয়ানো—মস্ত বড়। একটা বড় টেবিলের মত তার ঢাকুনিটা। একটু পরেই বাড়ীর 'মেমসাহেব' আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলিল। মেমসাহেবের চেহারাখানি সুন্দর। দীপকের বড় ভাল লাগিল। তার মা যেমন আগে সিন্দুরের টিপ্ পরিতেন, কপাল জুড়িয়া তেমনি সিঁথিতে মোটা করিয়া সিন্দুর দেওয়া, লাল কল্কা-পেড়ে সাড়ী, একটি সেমিজ; হাতে দু'খানি মোটা মোটা প্যাচ্কাটা সোনার বালা। একটু মোটা-সোটা, চলন ভারী। মোটের ওপর তাঁহাকে দেখিয়া দীপকের ভালই লাগিল। তাঁহাকেই চাকর বেহারা 'মেমসাহেব' বলিয়া ডাকে!

দীপক ও তাহার মেজদা তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি সস্নেহে দুজনাকেই আদর করিলেন। অন্য মেয়েরা ঘরে আসে যায়, কেহ দীপকের সঙ্গে কথা বলে না। মেমসাহেবই যা' একটু গল্প করিলেন। রাত্রে প্রচুর আহার—ইংরেজী-বাঙলা মেশান। টেবিল-চেয়ারে বসিয়া খাওয়া হয়, কিন্তু কাঁটা চামচের ব্যবহার নাই।

সে রাত্রি দীপকের দুশ্চিন্তাতেই কাটিল। কারণ পরের দিন বোর্ডিং-এ যাইতে হইবে।

সকালে জলখাবার চা খাইয়া দীপক ও তাহার মেজদা বোর্ডিং-এর দিকে রওনা হইলেন।

নাম-করা বোর্ডিং—বাঙলার বাহিরে হইলেও সুদূর বাঙলাতেও বোর্ডিংটির খ্যাতি অনেক গৃহেই পৌঁছিয়াছে।

একজন ম্যানেজার—তিনি প্রকারান্তরে এই বৃহৎ সংসারটির গিন্নী-মা। বয়স্ক, কি যেন ব্যারাম আছে। কথা বলিতে বলিতে একটা সোঁ সোঁ শব্দ হয়। প্রথমে ইনিই সাক্ষাৎ করিলেন। জিনিষ-পত্র চাকরের মারফত যথাস্থানে চলিয়া গেল। টাকা কড়ি লেনা দেনা হইয়া গেল। মাসে বাঁধা খরচ ত্রিশ টাকা—তার উপর দীপকের জন্য সকালে দুধ ও রাত্রে লুচি খাইবার বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে দীপকের জন্য আরও পনেরো টাকা বেশী খরচ পড়িবে। এই বিশেষ ছুটি খাদ্যের ব্যবস্থা দীপকের মায়ের অনুরোধ। মাসিক পঁয়তাল্লিশ টাকার হিসাব হইয়া গেল, আরও লাগিলে দেওয়া যাইবে, ইহাই স্থির রহিল।

অধ্যক্ষ কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন, ইতিমধ্যে তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকটিকে দেখিলে ভক্তি হয় না কিন্তু ভয় হয়। কাপড় চোপড় পরিষ্কার, কর্তাবার্ত্তা মাপা-জোঁকা দাঁত চাপিয়া কথা কন্, বুক চিতাইয়া দাঁড়ান্, অন্যদিকে চাহিয়া হাসেন; কিন্তু মিষ্টভাষী। সমস্ত কথার ভিতর একটি কথাই নানাভাবে প্রকাশ পায়।—তাঁহার বোর্ডিং-এ ছেলে পাঠাইতেই হইবে—এবং এই বোর্ডিং হইতে যাহারা "আউট্" হইয়া গিয়াছে—তাহারা সকলেই এখন কৃতবিদ্য এবং ভাল ভাল কাজ করিতেছে। তাঁহার ভাব দেখিয়া মনে হইল, অধ্যক্ষ মহাশয় টাকা পয়সা ছোঁন্ না, টাকার কথা যেন ভাল বোঝেনও না।

অধ্যক্ষ সন্তোষবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম দীপক? অ্যাঁ, খেলা ভালবাস? আমাদের এখানকার ছেলেরা খেলেই বেশী; তবে পড়তেও হয়। হ্যাঁ—হা-হা-হা।

কথাগুলি নীরস, কাটা কাটা, কিন্তু আড়চোখে চাওয়া ও একটা হাসি লাগিয়াই আছে।

দীপক বিদ্রোহী হইল। সে বলিল, আমি খেলতে ভাল বাসি না, আমি পড়তে ভালবাসি।

সন্তোষবাবু আবার উচ্চহাস্যে মাতিয়া উঠিলেন। ম্যানেজার অসীমবাবু বলিলেন, ত' বেশ, ছোঁকরা বড় হবে।

বোধ হয় নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়। একটু নাকিসুরেই কথা কন্।

এবার বিদায়ের পর্ব্ব। মেজদা কাঁদিলেন। দীপকও কাঁদিল। সন্তোষবাবু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন। অসীমবাবু ছিলেন, তিনিও কাপড় দিয়া চোখের কোণ মুছিলেন।

মেজদা বিদায় লইলেন। দীপকের মনে হইল, তাহার কণ্ঠরোধ হইতে চায়, নিঃশ্বাসের বাতাস যেন ফুরাইয়া গিয়াছে।

অসীমবাবু দীপককে লইয়া বোর্ডিং দেখাইতে চলিলেন। একটা ঘরে সব ছেলেদের বাক্স প্যাঁট্রা থাকে—তার নাম 'বক্স-রুম'। ঘরটি অন্ধকার—চারিধারে সারি সারি বাক্স সাজান। সেই ঘরেই কাপড় পরা ও কাপড় ছাড়া চলে। ছেলেদের নিজের কাছে টাকা পয়সা রাখিবার নিয়ম নাই। ম্যানেজারবাবুর জিম্মায় রাখিয়া দিতে হয়। ছেলেদের কাছে পয়সা কড়ি আছে ধরা পড়িলে শাস্তি পাইতে হয়, ম্যানেজারবাবু বিশেষ করিয়া দীপককে কথাটি শুনাইয়া দিলেন।

মস্তবড় একটা টানা বারান্দা। দু'খানি লম্বা কাঠের টেবিল পাতা, টেবিলের দু'ধারে বেঞ্চ সাজান। এটি আহারের স্থান। থালাবাসন ছেলেদের নিজেদের থাকিলেও, লোহার প্লেট্ ও লোহার গ্লাসের বন্দোবস্ত। তারপরই একটা বড় হল্—তাতে সারি সারি তক্তপোষ্ ফেলা। এটি ছেলেদের শোবার ঘর। দীপকের বিছানাটা আগেই একটি চৌকীর উপর পড়িয়াছিল। ষোলো নং চৌকী তাহার। এই ষোলো নম্বরটি যতদিন বোর্ডিং এ বাস করিতে হইবে ততদিন খাটে বিছানায় চাদরে কাপড়ে আঁকিয়া বেড়াইতে হইবে। ষোলো নম্বরের ছেলের সব-কিছু ষোলো নম্বর।

সে ঘর হইতে একটা বড় দরজা খুলিয়া স্কুল-রুমে যাইতে হয়। সেখানেই দুপুরে স্কুল বসে, সকালে সন্ধ্যায় বোর্ডিং-এর ছেলেদের Study Room—পড়িবার ঘর। বাড়ীর এক-

কোণে একটি বড় ইন্দারা—স্নানের সময় চাকর প্রত্যেক ছেলেকে দুই বালতি করিয়া জল তুলিয়া দেয়। তাহার বেশী লাগিলে ছেলেরা নিজে তুলিয়া লয়।

বাড়ীটার পেছন দিকে প্রকাণ্ড মাঠ। ছেলেরা খেলা-ধুলা করে। দুপুর বেলা গরু চরে। মাঠের শেষ সীমানায় একটা প'ড়ো একচালা। ইঁটের দেয়াল, খোলার ছাউনী। এই ঘরটা বোধ হয় ফালতু, বোর্ডিং-এর কোন কাজে আসে না। খানকতক ভাঙ্গা তক্তপোষ ও অন্যান্য বহুবিধ অকর্ম্মণ্য জিনিষে ঘরটি ভরা। দীপক প্রথম দিন হইতেই লক্ষ্য করিল, এই ঘরটির দিকে দুই চারজন ছেলে বারবার যাতায়াত করে।

বোর্ডিং-এর একটি বাগানও আছে। কয়েকটি রক্ত-জবা গাছ এবং নেহাৎ জল বিনে যত্ন বিনে মরে না এমন ক'টা হতভাগা গাছ সে বাগানখানির শোভা। বাড়ীটা কিন্তু প্রকাণ্ড।

বাড়ী দেখিয়া, অনেক নিয়মবিধির কথা শুনিয়া দীপকের ত প্রথম-পড়া মুখস্থ হইয়া গেল।

এবার সত্য সত্যই তাকে মনে করিতে হইল যে সে বোর্ডিং-এ আছে। কখনও যদি বা একটু ভুলিয়া থাকিবারও সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে বারম্বার একটা একটানা ঘণ্টার শব্দে ছেলেরা সচকিত হইয়া ওঠে এবং বোর্ডিং-এ আছে বলিয়া কাজে কর্ম্মে স্বীকার করিয়া লয়।

দীপক কিছুদিন থাকিয়াই শিখিল ঘণ্টা যে কারণে বাজে, প্রত্যেক ছেলে সেই কারণটিকেই অবহেলা করে। স্নানের সময় স্নান করিতে চায় না, পড়ার সময় পড়িতে চায় না, খাওয়ার সময় ঘণ্টা না পড়িতেও খাবার টেবিলের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। দীপকের মনও ক্রমে এই ঘণ্টার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল।

দিন দুই কোনও রকমে সে তাহার জন্য বিশেষ করিয়া বরাদ্দ দুধটুকু ও রাত্রে খাবার সময় লুচি খাইল। কিন্তু আর এরূপভাবে খাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব মনে হইল। সকলের সঙ্গে এক সঙ্গে খাইতে বসিয়া এমন করিয়া খাওয়া যায় না। তাহার লজ্জাও করে, ভালও লাগে না।

ক্রমে সকলের সঙ্গে আলাপ হইয়া গেলে দীপক জানিতে পারিল, বোর্ডিং-এ যে সব ছেলেরা আছে, তাহাদের বাড়ীর অবস্থা দীপকের চাইতে বড় একটা খারাপ নহে। নেহাৎ দুই একজন ছাড়া; কিন্তু তাহাদের নিজের বিশেষ কিছু না থাকিলেও আত্মীয়ের সাহায্যের দানে বোর্ডিং-এর খরচ তাহাদের বেশ চলিয়া যায়। এবং তাহারাই অহঙ্কারী বেশী, বাবু বেশী।

দীপক একদিন ম্যানেজারবাবুকে সব কথা খুলিয়া বলিল। বড়কর্ত্তার সঙ্গে ছেলেদের কথাবার্ত্তা কওয়া একটু দুঃসাধ্য। যখন তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া বোর্ডিং-এর অলিখিত নিয়মের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কাজেই যত আপীল-আদালত ঐ ম্যানেজারবাবুর কাছে।

ম্যানেজারবাবু লোকটি খুব ভদ্র, দয়ালু এবং স্নেহপ্রবণ। কিন্তু বোধ হয় বহুকাল রোগভোগ করিয়া তাঁহার মেজাজটা একটু রুক্ষ হইয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে সামান্য কারণেই তিনি চটিয়া উঠিতেন। এবং পরক্ষণেই তাঁহার হাঁফ ধরিয়া যাইত। ছেলেরা তবুও তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। নিজেদের মধ্যে কথা বলিতে হইলে তাঁহাকে মাসী-মা বলিয়া উল্লেখ করিত।

মাসীমাটি দীপকের মনের কথা বুঝিলেন। কিন্তু পাছে বোর্ডিং-এর কোনও কারণে দুর্নাম রটে সেই জন্য বড়কর্ত্তাকে কথাটা জানান দরকার মনে করিলেন। বড়কর্ত্তা সব শুনিয়াও কিছু বলিলেন না।

প্রতি শনিবারে বোর্ডিং-এ আত্মীয়দের কাছে চিঠি লিখিবার নিয়ম। ইচ্ছা না থাকিলেও সে দিন প্রত্যেককে অন্তত বাড়ীতে একখানা করিয়া চিঠি লিখিতেই হইবে। ছেলেদের নামে চিঠি আসিলে বা ছেলেদের চিঠি যা ডাকে যায় তাহা বড়কর্ত্তা পড়িয়া দেন। চিঠিতে কিছু আপত্তি-জনক মনে হইলে বড়কর্ত্তা ছেলেদের ডাকিয়া তাহা পুনরায় লেখাইয়া লন। বিশেষ করিয়া বোর্ডিং-এর নামে কোনও দোষারোপ হইতে পারে এমন চিঠি বাইরে যাওয়া অসম্ভব। বাড়ীতেও নয়। পুরোণ ছেলেরা তাহা ঠেকিয়া জানিয়াছে। কাজেই তাহারা চিঠিতে বড় একটা কিছু লিখিত না। ছুটির সময় বাড়ীতে আসিয়া যাহা বলিবার তাহা বলিত।

দীপক বাড়ীতে লিখিয়াছিল, তাহার পক্ষে লুচি বা দুধ

খাওয়া একেবারে অসম্ভব। বহুকাল পরে দীপক বাড়ী আসিয়া জানিতে পারিয়াছিল, এরূপ ধরণের কোনও চিঠি বাড়ীতে পৌঁছায় নাই। খরচ কিন্তু সমানই বরাবর পাঠান হইয়াছে।

যাহা হউক, সাত আটমাস এই বোর্ডিং-এ থাকিয়া দীপক যাহা কিছু জানিত না সবই শিখিল। প্রথম নম্বরে, লুকোন গোপনকরা ও মিথ্যাকথা বলা এ রাজ্যে একেবারে জল-চল্ হইয়া গিয়াছে দেখিল। প্রথমটা দীপক মিথ্যা কথা বলিত না। দোষ করিলে স্বীকার করিয়া ফেলিত। কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে শাস্তি পাইতে হইত। অন্যরা দোষ করিয়াও মিথ্যা কথা বলিয়া বেশ সারিয়া যাইত। মিথ্যা কথা বলাই সুবিধাজনক দেখিয়া দীপক তাহাতেও অভ্যস্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে যাইয়া আবার নিজে গিয়া সে যে মিথ্যাকথা বলিয়াছে তাহা স্বীকার করিয়া আসিত। বড়কর্তা তাহার অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে ডবল শাস্তি বিধান করিতেন। দীপকের মুখখানা ম্লান হইয়া যাইত। মনটা তাহার দমিয়া যাইত। তাহার প্রাণে দ্বন্দ্বের সঞ্চার হইল।

প্রথম বছরের বোর্ডিং-বাসের সময় ঠিক বড়-দিনের ছুটির পূর্ব্বে একটা ঘটনাতে দীপক বড়ই আঘাত পাইয়াছিল।

বোর্ডিং-এ সব বয়সের ছেলেরাই এক সঙ্গে থাকিত। কেবল বয়স নয়, বিবিধ চরিত্রের ছেলে। কেহ কেহ এমন ছিল যে, তাহাদের অসাধ্য কিছুই ছিল না। কোনও নূতন ছেলে আসিলে ইহারা তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিত। দীপককেও ইহাদের পাল্লায় পড়িতে হইল। ইহাদের মধ্যে একজন ত রীতিমত ওস্তাদ। দীপক তাহারই মুখে গল্প শুনিয়াছে, সে বোর্ডিং-এ আসিবার পূর্ব্বে বার দুই তাহার মায়ের বাক্স ভাঙ্গিয়া গহনা লইয়া পিট্‌টান দিয়াছে। পরে টাকা ফুরাইয়া যাওয়ায় বাড়ী ফিরিয়া আসে। কয়েকবার নানা রকম 'সাহসের' কাজ করাতে তাহার পিতা বেচারামবাবু নেহাৎ না পারিয়া তাহাকে বোর্ডিং-এ শুদ্ধ হইতে পাঠাইয়াছেন। আরও অনেকের অনেক অতীত ইতিহাস শুনিয়া দীপক স্তম্ভিত ও সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অনেক দিক সম্বন্ধে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিত। ইহারা সকলেই দীপকের চাইতে বয়সে বড়। কিন্তু দীপকের মত অনেক ছোটছেলেও ইহাদের শিষ্য আছে।

রাত্রি নয়টার সময় বোর্ডিং-এর ছেলেদের সকলকেই শুইতে যাইতে হয়। বাতি সব নিভিয়া যায়। বাতি নিভিবার পর আর ছেলেদের কাহারও সঙ্গে গল্প করিবার নিয়ম নাই। ঘুম হোক্ আর নাই হোক্, সব চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু পাশের ঘরেই রোজ রাত্রে মাষ্টার মশাইরা—যাঁহারা বোর্ডিং-এ থাকিতেন তাঁহারা—আলো জ্বালাইয়া বসিয়া গল্প করিতেন। মাঝে মাঝে ছেলেদের ঐ অন্ধকার নিস্তব্ধ ঘরেও তাঁহাদের হাসির রোল গড়াইয়া আসিত। ছেলেরা দিনের বেলা এই ব্যাপার লইয়া অনেক আলোচনা করিত।

(৮)

একদিন গভীর রাত্রে, সকলে তখন ঘুমে অচেতন, এমন কি মাষ্টার মশায়রাও। কে দীপকের গা ঠেলিয়া নাড়া দিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া প্রথমটা দীপকের একটু ভয় হইল। তাহার কানে কানে সে বলিল, ওঠ্, আমি ধীরু-দা।

অন্ধকার ঘর, কেবল বড় বড় জানালাগুলি দিয়া এক একটা জায়গায় যা একটু আলো আসিয়া পড়িয়াছে। দুটি প্রেতমূর্ত্তির মত দুই জনে অন্ধকার হল-ঘর পার হইয়া একটা জানালা ডিঙাইয়া বাহিরের বাগানে পড়িল। ধীরু-দা আগে আগে চলিয়াছে, দীপক কম্পিতপদে তাহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে। কোথায় চলিয়াছে সে কিছুই জানে না। ধীরু-দা'র আদেশ মানিতেই হইবে। কেন, দীপক তাহা জানিত না। কম্পাউণ্ডের দেয়ালের গা ঘেঁসিয়া একটা বুড়ো জবা গাছ। ধীরু-দা চোখের পলকে তাহার ডালের উপর পা দিয়া দেয়াল টপকাইয়া পড়িল। ওপার হইতে একটা হাত বাড়াইয়া ডাকিল, আয়। আর ভাবিবার সময় নাই। না গেলে কোনও দিকেই নিস্তার নাই। শোবার ঘরে একলা ফিরিয়া যাইতেও তাহার ভয় করিতেছিল। কি জানি যদি ধরা পড়িয়া যায়!

আবার ধীরু-দা'র কথা না শুনিলে কাল আর নির্য্যাতনের শেষ থাকিবে না। নিরুপায় হইয়া দীপক জবা গাছের ডালে পা দিয়া বেশ লাফাইয়া পড়িল। তাহার পূর্ব্বক্ষণেও সে ভয় করিতেছিল, বুঝি বা লাফাইতে পারিবে না। কিন্তু ওপারের রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখিল কেমন সহজে সব হইয়া গেল। আবার ধীরু দা ডাকিল, আয়, আমার পেছনে আয়, কোনও ভয় নাই।

দীপক তাই চলিতে লাগিল। বড় রাস্তার একটা পোলের কাছে আসিয়া ধীরু-দা পোলের নীচের গাঢ় অন্ধকারের দিকে হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, নাম্।

দীপক দ্বিরুক্তি না করিয়া পোলের নীচে নালায় নামিয়া পড়িল। হঠাৎ একটা বজ্রমুষ্টি সেই অন্ধকারে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। দীপক ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। ধীরু-দা তাহাকে ফেলিয়া কোথায় যে গেল তাহা আর সে জানিতে পারিল না। কিন্তু সেই অন্ধকারেও আন্দাজে টের পাইল তাহার মধ্যে দু'চার জন বোর্ডিং-এরই ছেলে। কারও মুখে কথা নাই, অন্ধকার নিঃঝুম রাত, মাঝে মাঝে দুই একটা ঝি ঝি পোকা কোথা হইতে ডাকিতেছে। কোথাও বা একটা ব্যাঙ হয় ত লাফাইয়া চলে। তাহারই সর্ সর্ শব্দ আচম্‌কা মনের ভিতর কেমন যেন ভয় জাগাইয়া দেয়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। হঠাৎ ধীরু-দা'র চাপা গলায় শব্দ হইল, সব ready, আস্‌ছে।

সবাই একটু নড়া-চড়া করিয়া বসিল।

নিস্তব্ধ রাজপথ দিয়া সেই নিরালা রাত্রে বহুদূর হইতে ঠক্ ঠক্ জুতার শব্দ। শব্দ ক্রমে কাছে আসিল,—এবার খুব কাছে।

ধীরু-দা কি একটা ইঙ্গিত করিল, তারপর চোখের নিমেষে সবাই রাস্তার উপরে উঠিয়া পড়িল।

দীপক কেবল মাত্র দেখিল, ধীরু-দা একটা কাপড় দিয়া একজন লোকের মুখ চোখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। দীপকের সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে লজ্জায় থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে কেহ বা লোকটির জামা কাপড়ে কালি ঢালিয়া দিয়াছে। একজন কাঁচি দিয়া লোকটির কিছু চুলও কাটিয়া লইয়াছে। লোকটি কথাও বলিতে পারে না, হাত পা বাঁধা পড়াতে নড়িতেও পারে না। মিনিট দুইয়ের মধ্যে সব কাজ শেষ। লোকটিকে ঐ ভাবে ঐ খানে ফেলিয়া সকলে যে যার চোখের পলক না ফেলিতে কোথায় উধাও হইয়া গেল।

দীপক প্রস্তুত ছিল না। সে হতভম্ব হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। আর তার বোর্ডিং-এ ফিরিতেও ইচ্ছা করিল না।

লোকটির দিকে চাহিয়া দীপকের মন ক্ষোভে, লজ্জায়, ভরিয়া উঠিল। এতগুলি লোক মিলিয়া এই গভীর নির্জ্জন রাত্রে একটি লোককে ধরিয়া এমন করিয়া অপমান করা তাহার কাছে একটুও ভাল লাগে নাই। সে আর কিছু না ভাবিয়া ধীরে ধীরে লোকটির হাত পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিল। হাত খোলা পাইয়া লোকটি দীপকের হাতখানা বাঘের মত চাপিয়া ধরিল। আক্রোশে, লজ্জায় মুখ বাঁধা অবস্থায়ও লোকটির নিঃশ্বাস গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। লোকটি ক্ষিপ্রহস্তে একহাত দিয়া মুখের বাঁধন টানিয়া খুলিয়া ফেলিল।

মুখ দেখিয়াই দীপক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, অ্যাঁ, স্যার!

ততক্ষণে লোকটির চোখের ঘোর কাটিয়া গিয়াছিল। লোকটিও বলিয়া উঠিল, তুই লক্ষীছাড়া দীপক! আচ্ছা, দেখে নেব, চল্।

আর কথা বার্ত্তা নাই, সন্তোষবাবু তাহার হাত ধরিয়া একেবারে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। দীপক একটুও জোর করিল না বা বাধা দিল না। বোর্ডিং-এর কাছে আসিয়া কি জানি কি ভাবিয়া সন্তোষবাবু তাহার হাত ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, আজ রাত্রে চুপ্ ক'রে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাক্‌বে। কাল সকাল-বেলা আমার ঘরে গিয়ে দেখা করবে।

এ দিকে বোর্ডিং-এর ভিতর এক মহাকাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। মাষ্টার ছাত্র সকলেই জাগিয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে আলো। সবাই ব্যস্ত। দীপকদেরই দলের একটি ছেলে, বিছানায় পড়িয়া প্রাণপণে চীৎকার

করিতেছে। দীপক গিয়া ছেলেদের মুখে শুনিল, তাহার পেটে অসহ্য ব্যথা।

বড়কর্ত্তাকে সবাই খোঁজাখুঁজি করিতেছে, কিন্তু তাঁহার ঘরে তিনি নাই। ধীরু-দাও একটা লণ্ঠন লইয়া এ-ঘর ও-ঘর করিতেছে।

হঠাৎ বাইরের বারান্দার এক কোণ্ হইতে ধীরু-দা'র গলা শোনা গেল, এই যে স্যার, অমুর ভয়ানক অসুখ। আপনাকে সবাই খুঁজ্‌ছে।

যে যে শুনিল, সকলেই বারান্দার দিকে গেল। তাহারা ফিরিয়া আসিল, দীপক দেখিল, বড়কর্ত্তা আসিলেন না। বরং ধীরুই বলিতেছে,—স্যারেরও বড় অসুখ। ভেদবমী হচ্ছে—হাত পা কাঁপছে ইত্যাদি। দীপক যতটুকু বা ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল, ধীরু-দা'র আকস্মিক এইরূপ ব্যবহারে তাহার বুদ্ধি যেন কেমন গুলাইয়া গেল। সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

সব মাষ্টাররা বড়কর্ত্তার ঘরে যাইতে সাহস করেন না। কয়েকজন পুরোণ ছাত্র ও দু একজন মাষ্টার ও ম্যানেজারবাবু সন্তোষবাবুর ঘরে গেলেন।

ঘরের মেঝেতে, টেবিলে কালি গড়াইয়া পড়িয়াছে। সন্তোষবাবুর চোখ মুখ বেশ বসিয়া গিয়াছে। মুখে কথা নাই, বিষণ্ণ বিহ্বল দৃষ্টি—চুপ করিয়া বিছানায় কাৎ হইয়া বসিয়া আছেন।

ডাক্তার আনা ও ঔষধের কথা বলাতে তিনি হাত নাড়িয়া নিষেধ করিলেন। আলমারীতে নিজের হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স ইসারায় দেখাইয়া দিলেন। চোখে মুখে এমন একটা ভাব—যেন সকলে চলিয়া গেলেই এখন তাঁহার ভাল লাগিবে। শেষ কালে ইসারা করিয়া সকলকে চলিয়া যাইতেই বলিলেন।

এদিকে ধীরু-দা'র কি সেবা! কি ত্রস্ত তার হাত চলে! যে ছেলেটি পেট ব্যথায় চেঁচাইতেছিল, তাহার পেটে তারপিন্ তেল মালিশ করিয়া, গরম জলের সেঁক্ দিয়া সে তাহাকে এরই মধ্যে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। মাষ্টার ও অন্যান্য ছাত্ররা তাহার সেবাকুশলতা দেখিয়াও অবাক্‌

ছেলেটিও এখন চীৎকার করা বন্ধ করিয়াছে। অনেকটা যেন সুস্থ, ঘুমাইতে চায় এমনি ভাব!

ধীরুই মোড়ল! সে বেশ করিয়া তাহার বালিশ গুছাইয়া দিয়া মুরুব্বির চালে বলিল, এখন একটু চুপ ক'রে ঘুমোও দেখি, সব সেরে যাবে। কাল সকালেই তুই পাঁড়ে-জীর কড়া থেকে হালুয়া কেড়ে খাবি—এমন খিদে পাবে দেখিস্।

ছেলেটিও বেশ পাশ ফিরিয়া শুইল, আর ঘুমে তার চোখ্ জড়াইয়া আসিল।

আলো নিভাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া যে যার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল—

সে-রাত্রি প্রভাত হইল।

—ক্রমশ

অনিল

সৈয়দ উদ্দীন

হে অনন্ত দুর্দ্দান্ত অনিল
তোমারে রেখেছে ঘিরে বিরাট নিখিল ;
ধরণীর নাট-মঞ্চে নৃত্য কর প্রকৃতি-দুলাল,
উৎপীড়ন তাই তব জননীর স্নেহ-নীরে স্নান করি
হয়ে যায় অন্তরের আনন্দ-প্রবাল।
চির শুভ্র শিশু, গেয়ে যাও গান
সৃজন-প্রভাতে কোন্ প্রকৃতির নিজ হাতে দান
সেই তব জীবনের গান—
তৃণে তৃণে নব কিশলয়ে,
বসুধার প্রতি রন্ধ্রে গোপন আলয়ে,
গভীর গুহার মাঝে অন্দরের নিষিদ্ধ আঁধারে
ছুটে তব প্রাণ-স্রোতস্বিনী শত মুক্ত ধারে।
নিষেধ যেখানে যত প্রাচীর গড়েছে তার বজ্রবাহু মেলি
চলা তব শাসনের সেই সব বেড়াজাল ঠেলি,
হে নির্ভীক প্রাণ,
সেই খানে নিত্য তব গুপ্ত অভিযান।
কাননের থরে থরে সাজাইয়া যৌবনের ডালা
যেথায় গোলাপ রচে স্বয়ম্বর-মালা,
হে চঞ্চল,
প্রমোদ উদ্যানে তার টেনে ধর মঞ্জুল অঞ্চল,
লুটাও ভাণ্ডার ;
বাতাসে কাঁদিয়া মরে আর্ত্ত গন্ধ তার।
চল আনমনে,
কাননে কাননে
চামেলীর ডালে ডালে মুছে যাও চুম্বনের লাল,
ফুল ছুঁড়ি ছুঁড়ে মারে শেফালী-রুমাল।

যত কিছু গুহ্য গূঢ় রহস্য-আঁধার
হে বায়ু, তোমার তরে খুলে দেয় দ্বার।
লজ্জার সঙ্কোচ ত্যজি ধরণীর নগ্ন মূর্ত্তিখানি
তোমার সম্মুখে আনে টানি ;
তুমি জান কাননের গোপন প্রলাপ,
বিহঙ্গের নিস্তব্ধ আলাপ,
ফুলে ফুলে ভ্রমরার প্রণয়-গুঞ্জন,
জলধির তরঙ্গ-গর্জ্জন।
কভু তুমি ভয়াল পাগল,
বনানীর শ্যাম জটা ধ'রে দাও দোল
নগ্ন দুঃশাসন,
প্রলয়-আক্রোশে তব টল মল ক'রে ওঠে সাগরিকা
দ্রৌপদীর সুনীল বসন
থৈ থৈ নৃত্য কর ক্ষ্যাপা মহেশ্বর,
বিদ্যুৎ-বাসুকী তব গ্রাস করে অনন্ত অম্বর ;
কণ্ঠে জ্বলে মরুভূর অগ্নি-অভিশাপ,
দুর্জ্জয় প্রতাপ—
কত শত তরী কর তটিনীর তল,
আকাশ সাগরে ডোবে মেঘপোতদল।
গ্রীষ্মের মশাল জ্বালি উলঙ্গ ভীষণ
দগ্ধ কর দূর আম্রবন,
তুমি জহ্নু, পিপাসা-বিকল,
গণ্ডুষে শুষিয়া নাও সাগরের জল
ধরণী বাড়ায়ে তার তপঃসিদ্ধ তুঙ্গগিরি হাত
মেগে নেয় বৃষ্টি-আশীর্ব্বাদ।
ধীরে থামে সব, আবার নিকুঞ্জ আনে পুষ্প-উপহার,
প্রভাতের কুসুম সম্ভার,
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগে পুনঃ কূজন গুঞ্জন
যূথিকার বনে বনে মালতীর ঘুমন্ত অধরে রেখে যাও
হে পথিক, রজনীর শিশির চুম্বন।

অতি-আধুনিক বাঙলা সাহিত্য

শ্রীঅমলেন্দু বসু

হালে, তরুণদের সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে গালি-গালাজ করা বা সমালোচনাচ্ছলে প্রচুর আত্মম্ভরিতা দেখানো কায়দা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে দেখা যায় যে, যাঁহারা সাহিত্যিক বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে ইচ্ছুক, অথচ রবীন্দ্র-প্রতিভার গভীরতায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছেন এবং তরুণদের সাহিত্য-সাধনায়ও যোগদান করিতে সুবিধা পান্ না, অর্থাৎ যাঁহারা ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে বায়ু ভক্ষণ করেন, তাঁহারাই এই প্রকার আলোচনা-সম্পর্কে বিশেষ মাতিয়াছেন।—নিদেন-পক্ষে সাধারণের সম্মুখে একটি মাকাল ফল স্থাপন করিয়াও যদি নাম কেনা যায়!

সম্প্রতি বিভিন্ন সাহিত্য-সম্মিলনে তথা-কথিত সাহিত্যিক-গণ বিভিন্ন প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তরুণদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ দ্বারা পাণ্ডিত্য জাহিরের চেষ্টা করিয়াছেন। নবীনদের যথেষ্ট ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এবং কেহ সেই সকল ত্রুটির উল্লেখ করিলেই বিচলিত হইবার মত তরল মতি তাঁহাদের নয়। কিন্তু এই সকল না-নবীন না-প্রবীণ সাহিত্যিকগণ এমন ভাবে আলোচনা করিতে সুরু করিয়াছেন, যেন আদি-কাল হইতে সাহিত্য-জগতের যাবতীয় ত্রুটি সঞ্চিত হইয়া দুর্ভাগা নবীনদের স্কন্ধে আসিয়া চাপিয়াছে। তাঁহারা যাহা কিছুই করুন্ না কেন—লিখিবার ভঙ্গী, গল্পের প্লট, কবিতার আদর্শ—এমন কি, তাঁহাদের ব্যক্তিগত চরিত্র, কথা কহিবার ভঙ্গী, চুল ছাটিবার ধরণ—সকলই বঙ্গ-সাহিত্যের এই পরম হিতৈষীদের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিতেছে।

একজন হিতৈষী এই নবীন সাহিত্যের নামকরণ করিয়াছেন,—অতি-আধুনিক। ইহা আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতেই কিনা পোষ্ট-রবীন্দ্রনাথ যুগ, নব-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া গেল! অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ যুগ গঠিত হইয়াছে, এ-কথা আমরাও বলি না;—সত্যানুভূতির সাধনা চলিয়াছে মাত্র। এই অবিশ্রান্ত, সুকঠোর সাধনার ফলে বঙ্গ-সাহিত্য-ইমারৎ গড়িয়া উঠিবে, হয় ত সাধকদের অনেকে অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তথাপি সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই "অতি-আধুনিক" কথা সাহিত্য প্রধানত "কল্লোল" ও "কালি-কলম" নামক মাসিকদ্বয়েই জন্ম ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। বিস্ময়ের কথা এই যে, কোনো সমালোচক শুচিতা, উদারতা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণের দোহাই দিয়াছেন সত্য, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুইটি মাসিকের নাম স্পষ্ট উল্লেখ করিবার মত অতিসামান্য নৈতিক-বলের পরিচয়ও তিনি দিতে পারেন নাই। "কল্লোল" পত্রিকার সবে পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে এবং "কালি-কলমে"র এক বৎসর পূর্ণ হইল মাত্র। এই দুইটি মাসিকে নিয়মিতরূপে কথা-সাহিত্য-সেবীর সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয়। জন দশেক তরুণ লেখক যদি চার বৎসরের মধ্যে দেড়খানা পত্রিকার অন্তর্বর্তিতায় রবীন্দ্র নাথের জীবিতাবস্থায় এবং তাঁহার বিরাট্ প্রতিভার অক্ষুণ্ণ প্রগতি সত্ত্বেও একটি স্বকীয় বিশেষত্বপূর্ণ সাহিত্য-যুগ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বহু তুচ্ছ সমালোচনা অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি। জগতের সাহিত্যে এমন অপরূপ যুগ-প্রবর্ত্তন কোনোকালে দেখা যায় নাই। আমরা বহুবার স্বীকার করিয়াছি, আমাদের বহু ত্রুটি আছে। কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাই তো জীবনের লক্ষণ, প্রগতির চিহ্ন। এই বিচ্যুতির "ঝরা শুকনো পাতা"র পথেই তো বন্ধু আসিবে! যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্য-সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং তরুণ-সাহিত্য-সাধনার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখেন, তাঁহাদের অনেকেও কোনো কোনো বিচ্যুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে, তাঁহাদের ধারণা ও কল্যাণ-কামনার প্রতি তরুণদেরও যথেষ্ট শ্রদ্ধা

আছে এবং তাঁহাদের কথা যতদূর সত্য ও সমীচিন বোধ হয়, নবীনগণ তাহা মানিয়া চলিতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল বয়োধিক্যের দাবীতে এই সাধনার প্রারম্ভেই ইহাকে অসহ্য মনে করিয়া অহেতুক চিরকলঙ্কের দাগ দিতে চান্, তাঁহারা ইহাকে আরও অসহ্য মনে করুন্, ইহাই প্রার্থনা করি। ক্রমে সেই অসহনতার ফলে তাঁহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করুন্, তরুণ-সাহিত্য তাঁহাদের চায় না।

পূর্ব্বোল্লিখিত সমালোচক মহাশয় তরুণদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া নৈতিক অশুচিতা সম্পর্কে অনেকখানি লিখিয়াছেন। নবীনগণ আপনাদের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মত প্রকাশ না করিলেও এইটুকু বিশ্বাস করেন যে, অযাচিত উপদেশদাতাগণ অপেক্ষা তাঁহাদের কাহারো নৈতিক বল ন্যূন নহে। বয়সের সংস্কার কাটাইয়া মনের প্রসার দিয়া তরুণগণ মানবতার বিচার করেন। প্রেমের সার্থকতা, চিত্তের শুচিতা প্রভৃতি সম্পর্কে লেখক গম্ভীরভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন, কিন্তু অতি মামুলী গৎ-এর নীরসতা ছাড়াইয়া তাহা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। লেখকের মত্ মানিলে কি স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যের সরসী হইতে শুধুই পঙ্কের কদর্য্যতা উঠিয়াছে?—(যদিও তাহা কদর্য্যতা বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না)—একটিও কমল কি সেখানে বিকসিত হইতে পারিল না? মাত্র তিন-চারি বৎসরের সাধনা; কিন্তু এই সামান্য কালের মধ্যেও কি তরুণগণ কেবল বিকৃত, বিষদুষ্ট অস্বাস্থ্যকর সাহিত্য-গঠনের চেষ্টাই করিলেন? (লেখক বহুবার আলোচিত ও নিন্দিত "রজনী হ'ল উতলা" নামক গল্পের উল্লেখ করিয়া নানা কথা মনে করিয়া অনেক আশঙ্কা করিয়াছেন। করুন্—তাহাতে আদৌ ক্ষতি নাই, কিন্তু কোন্ অসত্য সাহসে তিনি এই একটিমাত্র গল্পকেই তরুণ সাহিত্যের criterion স্থির করিলেন?) এই গল্প-লেখকের অপর কয়টি রচনা তিনি পড়িয়াছেন? তিনি দুঃখ করিয়াছেন, অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যে তেমন একটিও লেখক তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। শ্রীযুক্ত শৈলজা মুখোপাধ্যায়ের "অতসী" নামক পুস্তকের প্রত্যেকটি গল্প, তাঁহার অন্যান্য বহু গল্প, বঙ্গ-সাহিত্যের এই হঠাৎ-সমালোচক পড়িয়াছেন কি? পড়িয়া থাকিলে কখনই বলিতেন না, বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্য 'আমরা দশজনে প্রতিদিন ঘরে-বাহিরে যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সঠিক বিবরণ' মাত্র। পরন্তু, শৈলজাবাবু ব্যতীত অন্য কোনো তরুণ সাহিত্যসেবীর অপূর্ব্ব ক্ষমতাশালী রচনা কি সমালোচক মহাশয়ের নজরে পড়ে নাই? একমাত্র "রজনী হ'ল উতলা" গল্পটিই তিনি বেশ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন দেখা যায়। অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্য সম্পর্কে তিনি অনেক-কিছু লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু সশ্রদ্ধ, সূক্ষ্ম ভাবে তরুণদের প্রগতি লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

সমালোচক মহাশয় রিয়ালিষ্টিক সাহিত্যে সমস্যা-বিভ্রাটের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। য়ুরোপের Industrial Revolution ও তাহার আনুসঙ্গিক বিপুল সামাজিক আলোড়ন, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, এই সব কথা একটা কিছু নূতন নয়। স্বীকার করি, বঙ্গীয় জীবনের সহিত বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার সর্পিল গতির এখনও তেমন কোনো সাদৃশ্য দেখা যায় না। বাঙ্লা য়ুরোপের মত নগর-বহুল দেশ নয়। প্রকৃত বাঙালী-জীবনের বৃহত্তর অংশ এখনও পল্লীতেই পাওয়া যায়। তথাপি কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন কল-কারখানা বহুল অনেক সহরে সমাজ-জীবনে যে সকল সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রতীচির অর্থ-নৈতিক ও শ্রমজীবি-সমস্যার অনুরূপ। কোনো লেখক যদি এই সব বিষয় লইয়া গল্প লেখেন, তাহাতে অন্যায় কি? কুলি ধাওড়া, দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা, অস্বাস্থ্য, কলহ লইয়াই যদি গল্পের আরম্ভ ও শেষ হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সমালোচক মহাশয় কি আশা করেন যে, পাঁচ বৎসরের অনধিক সাধনার ফলে কোনো তরুণ সাহিত্য-সেবী গর্কী বা গল্‌স্‌ওয়ার্দীর মত গল্প বা নাট্য-চিত্রের সৃষ্টি করিতে পারিবেন? সমালোচক হইতে হইলে বোধশক্তিসম্পন্ন দরদী হৃদয় থাকা আবশ্যক। তরুণ সাহিত্য-সেবীদের মধ্যে প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন বলিয়া শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী

দিল্লীতে কহিয়াছেন মানব-মনের প্রাবল্য ও প্রাণের উজ্জ্বলতা নবীনদের মধ্যে কেবল অন্তর্গূঢ় হইয়া থাকিতে পারে না, তাঁহাদের প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে তাহা আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিবে। তবে সেই প্রকাশ সকল সৃষ্টির মধ্যে সমভাবে পরিস্ফুট না হইতে পারে—এবং তাহা না হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক; কিন্তু যে লেখকের নিজের হৃদয় প্রাণবন্ত, তিনি এই সকল ধুলী-ধাওড়ার দৈন্য ও কুশ্রীতার অন্তরালে প্রাণের শাশ্বত লীলার পরিচয় অবশ্যই পান্। তাই বলিয়া সেই দৈন্য ও কুশ্রীতাকে সত্যের আসন হইতে নামাইয়া দেওয়া চলে না, কারণ বাস্তবিকপক্ষে উহা সত্য। তরুণ সাহিত্যিক এই কুশ্রীতা চোখের উপর দেখেন, তাহার গ্লানি তাঁহার অন্তরকে পীড়া দেয়, লোকের অবসন্ন জীবনযাত্রার সংহার মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ভীত হন্, তাঁহার মননশীল হৃদয় বলে, ইহাদের ভিতরেও এককালে প্রাণ ছিল, কিন্তু আজ তাহা পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই বিপুল পঙ্গুতা, অসাফল্যের ইতিবৃত্ত রচনা করেন; ক্ষুব্ধ, অবরুদ্ধ মানব-মনে যে হাহাকার জাগে, নিষ্পেষিত হৃদয়ের আনাচে-কানাচে বঞ্চিত কামনা উঁকি দেয়—সেখানে পবিত্র সংযমের ঘৃত-দীপশিখা কি করিয়া জ্বলিবে? সৎ ও অসৎ গুণ সুপ্ত হইয়া আছে ঐ কুলীর চির একান্বিত জীবন-যাত্রার পথে। কোনো সুযোগে সেই সুপ্তি টুটিয়া গেলে পুনরায় সৎ ও অসতের সংগ্রাম লাগে, কিন্তু এতকাল সে তাহার পারিপার্শ্বিক জীবনে যাহা দেখিয়াছে তাহাতে তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সৎপ্রবৃত্তিগুলি অচিরেই পরাভূত হয়। একটি পুরুষ ও একটি রমণী অবৈধ উপায়ে তাহাদের বহুকালবঞ্চিত লালসা চরিতার্থ করিবার পূর্ব্বে মনে করে যে, তাহারা অন্যায় করিতেছে, কিন্তু বিবেকের এই সাবধান-বাণী অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, কারণ অসৎ প্রবৃত্তি এবং বঞ্চিত হৃদয়ের বিক্ষোভ উভয়ে মিলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। সেই স্থানে পুরুষ ও নারীর রক্তমাংসের কামনা যদি সহসা শান্তশুভ্র পবিত্রতায় পরিণত হয়, তাহা হইলে সুনীতি-পরায়ণ মহাত্মারা খুশী হইতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে মানবতার পরিচয় পাওয়া যায় না। স্থান-পাত্রবিশেষে অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের বুভুক্ষার বিবরণ নব-কামায়ণ হয় বলিয়া আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না।

সৎ ও অসতের এই সংগ্রামেই বংশ শতাব্দীর মানবের পরিচয়, তাহার প্রাণের সংজ্ঞা। সত্যের জয় বা অসত্যের উল্লাসে কিছু আসে যায় না, মনের এই বিরাট উত্থান, পতন, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গেই তাহাকে চিনিতে পারি—সেখানেই তাহার প্রাণের শাশ্বত লীলা। এই বিপুলতার পরিচয় কি সমালোচক মহাশয় "ধ্বংস-পথের যাত্রী এরা, "সংক্রান্তি," "বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে" প্রমুখ কথা-চিত্রে পান নাই? না পাইয়া থাকিলে আমরা পুনরায় তাহার সূক্ষ্ম বোধশক্তিকে সন্দেহ করি এবং সমালোচকের আসন তাঁহাকে দিতে নারাজ।

স্থানে স্থানে লেখকের বিবেচনাহীন স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বিশ্বসাহিত্যের অর্থ তরুণদল Continental literature করিয়াছেন, এরূপ অসম্বদ্ধ অনুমান করিবার অধিকার কে তাঁহাকে দিল? তিনি লিখিয়াছেন, "continent—বিশ্ব"। তরুণগণ এখনও তরুণই আছেন: মনের দিক দিয়া তো নয়ই, বয়সও তাঁহাদের এখন পর্য্যন্ত বাহাত্তুরে ধরে নাই যে, মাইনর ছাত্র পর্য্যন্ত যে শব্দের প্রকৃত অর্থ জানে, তাহাও তাঁহারা জানেন না। অল্প বয়সেই গর্কী, হাম্‌সুন পর্য্যন্ত পড়াও যেন একটা অপরাধ। কিছুদিন পূর্ব্বে অপর কোনো এক পত্রিকায় "জহুরী" নামে এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন—এই সব খোকা-সাহিত্যিকেরা যে গর্কি-হাম্‌সুনের নাম আওড়ায় তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বয়সের তারতম্য অনুসারে অধ্যয়নেরও শ্রেণী-বিভাগ করিতে হইবে নাকি? এত বৎসর হইতে এত বৎসর পর্য্যন্ত ডিকেন্স্, থ্যাকারে শেরিডান্ তারপর রলাঁ ফ্রাস্, শ'পড়া চলিতে পারে!—কেহ যদি "Toilers of the Sea" না পড়িয়া ফ্রাঁস্ বা হাম্‌সুনের যে-কোনো বই পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে কেহ-কেহ যতই বিস্মিত হউন না কেন, আমরা তাঁহাকে তাঁহার সুবিবেচনার জন্য ধন্যবাদ দিব। Continental literature-এর ফিরিস্তি আওড়ান যদি তরুণদের ফ্যাসান হইয়া থাকে, তবে

অনেকের পক্ষে Classical literature-এর দোহাই দেওয়াটাও ফ্যাসান বিশেষ। সাহিত্যে Classic বলতে কি একটা বিশেষ যুগ বা কয়েক শতাব্দী লইয়া গঠিত বিশেষ একটা কাল বুঝায়? (ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় যুগে পূর্ব্বতন চসার্ প্রভৃতি Classical ছিলেন, আবার এককালে মার্লো, শেক্সপীয়ার প্রভৃতি সেই এলিজাবেথীয় যুগের মনীষীগণই Classical হইয়া গেলেন। এই আধুনিক-তর কালের স্কট্ ডিকেন্স্ থ্যাকারে প্রভৃতি আবার বিংশ শতাব্দীতে Classical রূপে পরিচিত; তারপর এই আধুনিক নবতম যুগের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ লেখক—হার্ডি কিপ্লিং, কন্‌রাড্ হয়-তো কোনো অনাগত কালে পুনরায় Classical বলিয়া গণ্য হইবেন। যে-সকল শ্রেষ্ঠ লেখক যে-কোনো কালে বর্ত্তমান থাকিয়াও বিশ্ব সাহিত্যের (বিশ্ব-সাহিত্য মানে কোনো বিশেষ কালের য়ুরোপের সাহিত্য নয়—আদিযুগ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জগতের যে স্থানে যে কালে যত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহারই অপূর্ব্ব ভাণ্ডার) সম্পদ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারাই Classical রূপে পরিচিত। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসও Classical আবার রবীন্দ্রনাথও Classical.

সমালোচক মহাশয় একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই বা কি করিয়া জানিলেন তরুণগণ ডিকেন্স থ্যাকারে পড়েন না? থ্যাকারে-ডিকেন্সের যতটুকু সম্মান প্রাপ্য তরুণদল তাহা তাঁহাদিগকে দিয়াছেন বা দিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভিক্টর্ হুগোর বইও তাঁহারা পড়িতেছেন, টল্‌স্টয় টুর্গেনিভের সঙ্গেও তাঁহাদের পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা আছে। উপরন্তু তরুণগণ হার্ডি, ওয়েল্‌স্, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি পড়েন, অস্কার ওয়াইল্ড্, বার্নার্ড শ'র সহিত পরিচিত আছেন, ক্‌নাট্ হ্যামসুন... রলাঁ আনাতোল ফ্রাঁস... [illegible] তাঁহারা অনুরাগী, নোগুচি, ইয়েট্‌সের তাঁহারা ভক্ত। পুরাতনপন্থীরা হয় তো বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে, যে বয়সে তাঁহারা মেরেডিথ্, ব্যাল্‌জাক্ পড়িতেন, সেই বয়সে তরুণগণ কিরূপে এই সব লেখকের লেখা পড়িয়া আধুনিক সাহিত্যের চর্চ্চা করেন?) তরুণগণ ভালবাসা, পরচর্চ্চা অপেক্ষা মানসিক উন্নতির দিকেই অধিক লক্ষ্য রাখেন। কেবল যদি অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগ ও বৈষম্যের ধারা বুঝিয়াই পড়িতে হয়, তাহা হইলে সাহিত্যচর্চ্চা করাই কঠিন হইয়া উঠিবে। কেন না, হার্ডি পড়িতে হইলে থ্যাকারে পড়িতে হইবে, থ্যাকারে বুঝিতে হইলে সুইফ্‌ট্ না পড়িলে চলিবে না, সুইফ্‌ট্ বুঝিতে হইলে শেক্‌স্‌পীয়ার্ পড়া নিতান্ত দরকার, চসার্ না বুঝিলে শেক্‌স্‌পীয়ার্ পড়া চলে না—এবং Old English ও Anglo Saxon-এর অখ্যাতনামা লেখকদের সহিত পরিচিত না হইলে চসার্ বুঝা চলে না। কাজেই দেখা যায়, সমালোচক মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে চলিতে হইলে সাহিত্যচর্চ্চা ছাড়িয়া ভাষাতত্ত্বের চর্চ্চা আরম্ভ করিতে হয়।

য়ুরোপীয় সাহিত্য-সম্পর্কে সমালোচক-মহাশয় মূল, শাখা প্রভৃতির উপমা আনিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত যে, সাহিত্য পলিটিক্স্ এক জিনিষ নয় যে, কাল-বিশেষে অন্তরে ও বাহিরে বেমালুম বদলাইয়া যাইবে। সাহিত্য-সেবীর হৃদয়ে যে ভাবের ক্রিয়া হয় তাহা চিরন্তন প্রকাশের ভঙ্গী বিভিন্ন মাত্র। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাবৃটের মেঘ কালিদাসের অন্তরে যে বিরহবেদনার সঞ্চার করিয়াছিল, আজিও ঘনশ্যাম মেঘ দেখিয়া কবির অন্তরে তেমনি তীব্র অনুভূতি জাগে। হোমার্, ভার্জ্জিল, বাল্মীকি ব্যাস সাধারণ মানবজীবনের অন্তরালে যে মহামানবতাকে পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন, বিংশ শতাব্দীর লেখকও সেই বিপুল ব্যক্তিত্বকে অপর ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। তাই বিংশ শতাব্দীর আইজাকের মধ্যে মনুষ্যের সরলতম ভাবের ক্রিয়া দেখি, পিয়েরহোম্-এর মধ্যে উচ্ছ্বসিত উদারতার উদ্দীপনা দেখি, প্যাফ্‌নুতিয়া-র মধ্যে নরচিত্তের চিরন্তন সংগ্রাম লক্ষ্য করি। ভাব চিরন্তন, কেবল তাহা নব-নব ভঙ্গীতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রয়োজন কি ফ্রাঁস্ বুঝিতে হইলে ব্যাল্‌জাক্ পড়িবার? হার্ডিকে বুঝিতে হইলে থ্যাকারে পড়িবার?

তরুণগণ নৈরাশ্যকে জানেন, কিন্তু তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে তাঁহারা চান না। জীবনে কি কেবল পবিত্রত

ও আশাকেই চিনিতে হইবে? তাহা হইলে প্রকৃত জীবনের সম্মুখীন হইলাম কোথায়? আমাদের অন্তরের নিভৃত নীড়ে আশা ও নৈরাশ্য উভয়ে পাশাপাশি বাস করে, সেই ব্যথিত, নিপীড়িত প্রাণধারাকে আমরা সযত্নে প্রতিপালন করিতে চাই—সে আমাদের বিলাস। আশাকেও আমরা চিনি—সে আমাদের গৌরব। আশা ও হতাশার বিঘোষিত সংগ্রামে আমাদের জীবন-যাত্রার আরম্ভ, প্রগতি ও পরিণতি।

মীনকেতন

ন্যুট্ হামসুন

অনুবাদক—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছয়

গুলি ছোঁড়া ছেড়ে দিয়েছি কি না একজন আমাকে জিগ্‌গেস কর্‌লে। দু দিন মাছ ধর্‌তে বেরোলেও, পাহাড়ে পাহাড়ে আমার গুলি ছোঁড়ার সাড়া তার কানে পৌঁছোয়নি। গুলি আর ছুঁড়িনি বটে। যতদিন খাবার ছিল ঘরেই বসে' ছিলাম।

তৃতীয় দিনে বন্দুক কাঁধে নিয়ে বেরোলাম। অরণ্যানী সবুজ হয়ে আস্‌ছে, মাটি আর গাছের গন্ধ পাচ্ছি, স্যাঁৎসেঁতে শ্যাওলার আবরণ ফুঁড়ে তরুণ তৃণ মাথা তুলেছে। মনটা খুব ভারী, খালি বসে' থাক্‌তে ইচ্ছা করে।

কাল সেই জেলেটার সঙ্গে দেখা হওয়া ছাড়া এ তিন দিন একটি মুখও দেখিনি। ভাবি, যেখানে বনের যে ধারটায় আগে একদিন জোম্‌ফ্রু, এডভার্ডা আর ডাক্তারকে দেখেছিলাম, আজ সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরবার মুখে সেইখানেই কারু সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে হয়ত। হয়ত ওরা সেই পথ ধ'রেই আবার বেড়াতে বেরিয়েছে, হয়ত,—হয়ত বা নয়। আর সব ছেড়ে ওদের দুজনের কথাই বা কেন ভাবি? দুটো পাখী মেরে তখুনি রেঁধে ফেল্লাম। কুকুরটা বেঁধে রাখ্‌লাম তারপর।

শুক্‌নো মাটিতে শুয়ে শুয়ে খাই। পৃথিবীকে কে ঘুম পাড়িয়েছে। খালি খোলা হাওয়ার মৃদুল একটি নিঃশ্বাস আর এখানে সেখানে পাখীদের গুঞ্জন। শুয়ে শুয়ে দেখি, হাওয়ায় গাছের ডালপালাগুলি আস্তে আস্তে দুল্‌ছে; দুষ্টু হাওয়া শাখায় শাখায় পরাগ চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছে আর যত সরল কিশোরী কুসুমের মর্ম্মকোষ পরিপূর্ণ করছে। সমস্ত বন যেন আনন্দে ভ'রে গেছে।

গাছের ডালে শুঁয়োপোকা নিজকে টেনে নিয়ে চলেছে—অবিশ্রান্ত ওর চলা, বিশ্রাম নেই ওর। কিছুই যেন দেখে না, ওপরে মাথা তুলে কি যেন ধর্‌তে চায়, মাঝে মাঝে মনে হয় একটা নীল সুতোর গুটি দিয়ে ডালটার বরাবর কে তুর্কি-সেলাই করছে। হয়ত সন্ধ্যাশেষে ও ওর চলার শেষ পাবে।

সুষুপ্ত! উঠি, চলি, ফের বসি, ফের উঠে পড়ি। প্রায় চারটে হল। ছটার সময় বাড়ী গেলেই চল্‌বে,

দেখি কা'রো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কি না। আরো দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এম্‌নিই অস্থির হয়ে উঠেছি,—জুতোর থেকে ধুলো ঝাড়ি, জামার থেকে খড়কুটোগুলো। যে সব জায়গা দিয়ে হাঁটি, সবাইর সঙ্গেই আমার চেনা আছে। গাছ আর পাথরগুলি তেম্‌নি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, পায়ের নীচে পাতাগুলি খস্‌খস্‌ ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে ওঠে। এই একঘেয়ে নিঃশ্বাসের ওঠা পড়া, এই সব পরিচিত গাছপালা পাথর আমার কাছে অনেকখানি। আমার সমস্ত অন্তরে অব্যক্ত ধন্তবাদ পুঞ্জিত হয়ে ওঠে—সবাই আমার প্রতি প্রসন্ন, সব যেন আমার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—সব কিছুকেই ভালোবাসি আমি।

একটা ছোট মরা ডাল কুড়িয়ে হাতে নিয়ে বসে' বসে' ওর দিকে চেয়ে থাকি, আর নিজের কথা ভাবি। ডালটা প্রায় প'চে এসেছে, ওর জীর্ণ বাকল আমাকে স্পর্শ করছে, সমস্ত হৃদয় করুণায় ভরে উঠেছে। ফের যখন উঠে পড়ি, ডালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলি না, ধীরে ধীরে শুইয়ে রাখি, আর ওকে ভালোবাসি—এমন চোখে ওর পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। একেবারে চ'লে যাবার আগে আর একবার ওর দিকে ভিজা চোখে তাকাই— হয়ত ওখানে একলা পড়ে' থাক্‌বে।

পাঁচটা। রোদ আজ আর আমাকে সময় ঠিক করে' বলে দিতে পারছে না। সমস্ত দিনই ত পশ্চিমমুখে হাঁট্‌ছি। কুটীরের কাছে রৌদ্রের যে চিহ্নটি আমার চেনা, সে চিহ্নটি পড়্‌বার আধ ঘণ্টা আগেই এসে পড়ে যেন। জানি, তবু মনে হয় ছটা বাজ্‌তে আরো একঘণ্টা বাকি। তাই ফের উঠে পড়ি, একটু হাঁটি। পায়ের তলে পাতাগুলি তেম্‌নি কথা কয়ে ওঠে। এম্‌নি করে একঘণ্টা কাটে।

ছোট ঝর্ণাটির পানে তাকাই—আর সেই কারখানাটার দিকে। সারা শীত বরফেই ঢাকা ছিল ওটা। কারখানা চল্‌ছে, ওর গণ্ডগোল আমাকে নাড়া দিলে, তক্ষুনিই থাম্‌লাম।

"অনেকক্ষণ বাইরে রয়েছি।" জোরে বলি। সমস্ত দেহের মধ্যে ব্যথার শিখা যেন ধেয়ে চলে, তক্ষুনি ফিরি, ঘরমুখো পাড়ি দিই। অনেকক্ষণ বাইরে কাটালাম এই কেবল মনের মধ্যে গুমরে ওঠে। জোরে চলি, তারপর দৌড়ুই। কি যেন কি একটা কিছু হয়েছে, ঈশপ যেন বোঝে, দড়িটা টানে,—আমাকে টেনে নিয়ে চলে, মাটি শোঁকে আর সন্দেহে নিঃশ্বাস ফেলে—চঞ্চল হয়ে উঠেছে যেন। শুকনো পাতা চারিদিকে মর্ম্মরিত হচ্ছে! যখন বনের ধারে এলাম, কেউই নেই সেখানে—না; সব নিঝুম, সেখানে কেউ নেই।

"এখানে কেউই নেই।" নিজেকে বলি। আশা মিট্‌ল না ব'লে খুব খারাপ লাগে না কিন্তু।

বেশীক্ষণ দেরি কর্‌লাম না, চল্‌লাম, কুটীর পেরিয়ে গেলাম,—একেবারে সিরিলাণ্ড্‌-এ। সঙ্গে ঈশপ, আমার ব্যাগ আর বন্দুক—যা কিছু আমার সম্পত্তি।

ম্যাক আন্তরিক বন্ধুতায় আমাকে আপ্যায়িত কর্‌লে। খাবার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে বললে।

সাত

আমার চার পাশের লোকদের মন হয়ত পাঠ করতে পারি একটু একটু—এম্‌নি মনে হয়—কিন্তু মোটেই হয়ত তা নয়। যখন আমার দিন ও মন ভালো থাকে, মনে হয় অনেকদূর পর্য্যন্ত যেন ওদের প্রাণের তল খুঁজে পাই—আমি নাই বা হলাম বিদ্বান, নাই বা কুশলী। একটি ঘরে সবাই বসি—কয়েকজন পুরুষ, কয়েকটি মেয়ে আর আমি, ওদের মনের মধ্যে কি হচ্ছে, ওরা আমার সম্বন্ধে কি ভাবছে, সব যেন দেখ্‌তে পাই, বুঝি। ওদের চোখের দীপ্তির দ্রুত অল্প একটুখানি পরিবর্ত্তনের মধ্যে কি যে আছে; মাঝে মাঝে রক্তের ছোপে ওদের গাল রঙীন হয়ে ওঠে, কখনো কখনো বা অন্তদিকে চাইবার ভাণ ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখে। বসে' ব'সে এই সব লক্ষ্য করি। কেউ কিন্তু স্বপ্নেও ভাবে না, আমি ওদের সমস্ত হৃদয় তাঁতি পাঁতি করে খুঁজে ফির্‌ছি,—সব দেখে ফেলেছি। অনেকদিন পর্য্যন্ত তাই মনে হ'ত—যার সঙ্গে দেখা তারই অন্তরখানি আমার আঁখির কাছে খোলা রয়েছে। কিন্তু হয়ত তা নয়, নয়।…

সমস্ত সন্ধ্যাটা ম্যাক-এর বাড়ীতে কাটালাম। তক্ষুনি চলে যেতে পারতাম, ওখানে বেশীক্ষণ বসে থাক্‌তে ভালো

লাগ্‌ছিল না বটে,—কিন্তু আমার সমস্ত মন এদিকে ঝুঁকে পড়ছিল ব'লেই কি এখানে আসি নি? এখুনিই চলে যাই কি ক'রে? হুইষ্ট্ খেল্‌লাম আমরা, খাওয়ার পর তাড়ি খেলাম। ঘরের খানিকটা আমার পিছনে, মাথা সমুখের দিকে নোয়ানো।—আমার পেছনে এড্‌ভার্ডা যাওয়া আসা করছিল। ডাক্তার বাড়ী চলে গেছে।

ম্যাক তার নতুন বাতিগুলির ঢং আমাকে দেখাতে লাগ্‌ল—উত্তর জিলায় এই প্রথম মোমবাতির লণ্ঠন। চমৎকার ওগুলো, তলায় ভারী সিসের পা। ম্যাক্ রোজ সন্ধ্যায় নিজেই ওগুলো জ্বালায়, পাছে দৈবাৎ কোন দুর্ঘটনা হয়। সে দু' একবার তার ঠাকুরদা কন্‌সাল-এর গল্প করলে।

ওর জামার হীরেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—"এই ক্রচ্‌টা কার্ল জোহান্ নিজের হাতে আমার ঠাকুরদা কন্‌সাল ম্যাককে দিয়েছিলেন।"

ওর স্ত্রী মরে' গেছে, একটা ঘরে তার চিত্রিত ফটোটা দেখাল। মেয়েটিকে দেখ্‌তে খুব সম্ভ্রান্ত, মাথায় লেস্‌ওয়ালা টুপি, মুখের হাসিটি ভারি অকুণ্ঠ। সেই ঘরেই একটা বইয়ের তাকে কতগুলি পুরোনো ফ্রেঞ্চ্ বই, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি হয়ত। সোনালিতে মোড়া, অনেক মালিকই গায়ে গায়ে তাঁদের নাম খুদেছেন। কতগুলি শিক্ষাসম্বন্ধীয় বইও দেখা গেল—ম্যাক-এর বিদ্যাবুদ্ধি বলে' কিছু আছে তা হ'লে।

গুদাম ঘর থেকে ওর দুই সহকারীকে ডাকা হল হুইষ্ট্-এর খেড়ু হতে'। ওরা ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে খেলে, ভয়ে ভয়ে হিসাব রাখে, গোণে, অথচ ভুল করে। একজনকে এড্‌ভার্ডা নিজের হাতে দেখিয়ে দিচ্ছিল!

আমি গ্লাশটা উল্টে দিলাম; দাঁড়িয়ে পড়লাম লজ্জায়।

"ঐ যা—গ্লাশটা উল্টে গেল।" বল্লাম।

এড্‌ভার্ডা খিলখিল করে' হেসে উঠল। বল্লে—"যাক গে, তাতে আর কি?" সবাই হেসে আমাকে আশ্বস্ত করলে যে ওতে কিছুই হয়নি। গা'টা মুছে ফেলবার জন্য একটা তোয়ালে দিলে; ফের খেলা চলল। এগারোটা বেজে গেল দেখতে দেখতে

এড্‌ভার্ডার হাসিতে মনে অস্পষ্ট একটি ব্যথা বোধ হচ্ছিল। ওর মুখের দিকে চাইলাম, ওর মুখ যেন আর তত সুন্দর নয়, যেন নেহাৎ বাজে হয়ে গেছে। সহকারীদের ঘুমুতে যাবার সময় হয়েছে ব'লে ম্যাক খেলা ভেঙে দিলে। তারপর সোফায় হেলান্ দিয়ে বসে' আমার সঙ্গে পরামর্শ সুরু করলে—বাড়ীর সমুখে কি রকম সাইন বোর্ড দেওয়া যায়। আমার মতে কি রঙ সব চেয়ে ভালো মানাবে?

ভালো লাগছিল না এ সব, কিছু না ভেবেই বল্লাম—"কালো।"

ম্যাক তক্ষুনিই তাতে রাজী হল। বল্লে—"কালো? হাঁ, আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম। ঘন কালো হরপে 'নুন আর পিপে'—চমৎকার দেখাবে।…এড্‌ভার্ডা, তোমার ঘুমুতে যাবার সময় হয়নি?"

এড্‌ভার্ডা উঠে আমাদের হাত নেড়ে শুভরাত্রি জানিয়ে ঘর ছেড়ে চলে' গেল। আমরা ব'সেই রইলাম। গেল বছরে যে রেল লাইন খোলা হয়েছে তারই গল্প সুরু হল—প্রথম টেলিগ্রাফ লাইনের গল্প।

"যখন এখানে টেলিগ্রাফ আস্‌বে, সে ভয়ানক আশ্চর্য্য কাণ্ড হবে কিন্তু।"

চুপচাপ।

"এই রকমই হয়।" ম্যাক বল্লে—"সময় ভেসে চলেছে। আজ আমার ছেচল্লিশ বছর বয়সে চুল আর দাড়ি পেকে উঠেছে। তুমি আমাকে দিনের বেলায় দেখলে যুবক বলেই ভাববে নিশ্চয়, কিন্তু সন্ধ্যাকালে একলা বসে' আমি আমার যৌবনকে বেশি অনুভব করি। একা বসে' বসে' 'পেশান্স' খেলি। চার দিকে একটুখানি নোংরা করে' রাখলেই বেশ বোঝা যায়। হা হা!"

"নোংরা করে' রাখলে?" জিগগেস করলাম।

"হাঁ।"

মনে হল ওর চোখে যেন পড়তে পারি…

জায়গা ছেড়ে উঠে ও জান্‌লার কাছে গিয়ে বাইরের পানে তাকাল। একটুখানি নীচু হ'ল, ওর রোমশ ঘাড়টা দেখলাম। আমিও উঠলাম। ও চারদিক চেয়ে ওর লম্বা, ধারালো-মুখ জুতো বাড়িয়ে আমার কাছে হেঁটে এল।

ওয়েষ্টকোটের পকেটে দুটো বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে বাহু দুটো একটু দোলালে, যেন ও দুটো ওর পাখা,—তারপর কাসল। দরকার হ'লে ওর নৌকো নেবার কথা ফের বল্লে। পরে হাত বাড়িয়ে দিলে। "দাঁড়াও একটু, আমিও যাই।" ব'লে বাতিগুলি নিবিয়ে দিলে। হাঁ, একটু হাঁটতে ইচ্ছা করছে; এখনো রাত ত' বেশী হয়নি।"

আমরা বেরুলাম।

কামারের বাড়ীর ধারের রাস্তা দেখিয়ে ও বল্লে—"এই পথে।— সোজা হবে।"

"না। ঐ বাটের রাস্তা ঘুরেই সোজা হবে।"

এই নিয়ে একটু তর্ক হল, কেউই কারু কথায় রাজী হয় না। জানতাম, আমারটাই সোজা, তবুও ও কেন যে বারে বারে ঐ রাস্তার পক্ষ নিচ্ছে বোঝা কঠিন। ও বল্লে, যে যার রাস্তায় যাক্, যে আগে যাবে সে কুঁড়েতে অপরের জন্য অপেক্ষা কর্‌বে।

দু'জনে রওনা হলাম। ও দেখতে না দেখতেই বনের মধ্যে হারিয়ে গেল।

যেমন হাঁটি তেমনি হাঁটছিলাম। মনে হল নিশ্চয়ই পাঁচমিনিট আগে গিয়ে পৌঁছুব। কুঁড়েয় গিয়ে দেখি ও আগেই এসেছে কিন্তু। আমাকে দেখেই হেঁকে উঠল—"কি বলেছিলাম হে? আমি বরাবর এ পথ দিয়ে যাওয়া আসা করি—এই সব চেয়ে সোজা।"

বিস্ময়ে ওর দিকে তাকালাম ও শ্রান্ত হয়নি, দৌড়ে এসেছে এমনিও মনে হয় না কিন্তু। বেশীক্ষণ দাঁড়াল না, বন্ধুর মতো শুভরাত্রি জ্ঞাপন ক'রে চ'লে গেল সেই পথ দিয়েই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগ্‌লাম, এ ভারি অদ্ভুত তো! দূরত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা ছিল বলেই ত' জানতাম—দু পথ দিয়েই ত' বহুবার যাতায়াত করেছি। তবে? তুমি ফের ভালো মানুষ সেজে এমনি করে' দুষ্টুমি কচ্ছ, ম্যাক্! সমস্ত জিনষই কি ফাঁকি?

বনের মধ্যে মিলিয়ে যেতে না যেতে ওর পিঠটা আবার দেখ্‌লাম।

ওর পেছনে পেছনে চলেছি তাড়াতাড়ি, কিন্তু অতি সংর্পণে। সমস্ত রাস্তা ও ওর মুখ মুছছে; দৌড়ে আসেনি —এ কথা আর বিশ্বাস করব না! আবার খুব আস্তে আস্তে চলি আর সতর্ক হয়ে ওকে পর্য্যবেক্ষণ করি। কামারের বাড়ীর কাছে ও থাম্‌ল। লুকিয়ে পড়্‌লাম;— দরজা খুলে গেল; ম্যাক বাড়ীর মধ্যে ঢুকলে।

সমুদ্র আর ঘাসের দিকে তাকিয়ে বুঝ্‌তে পারি রাত একটা হয়েছে।

আট

নিশ্চিন্তে আরো ক'টা দিন কাটল, অরণ্য আর এই অসীম নির্জ্জনতাই আমার বন্ধু। একাকী থাকা কাকে বলে আগে জানিনি। এখন ভরা বসন্তের দিন, নানান্ গুল্মের জন্মোৎসব, কলকণ্ঠ পাখীর দল বেরিয়ে এসেছে,— সব পাখীকেই চিনি। নির্জ্জনতা ভাঙ্‌বার জন্য মাঝে মাঝে পকেট থেকে দুটো পয়সা বা'র ক'রে বাজাই। ভাবি, যদি ডাইডেরিক্ আর ইসেলিন্ এসে দাঁড়ায় চোখের কাছে।

রাত ফের ছেয়ে আসে, সূর্য্য সমুদ্রে ডুবে ফের লাল তাজা হয়ে ওঠে, যেন জল থেকে ডুব দিয়েছিল। এ রাতগুলি ধ'রে যা তা সব ভাব্‌ছি, কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না। বনের দেবতা কি তরুশাখায় ব'সে আমাকে লক্ষ্য করছেন—কি করি আমি? ওর উদর বুঝি উন্মুক্ত, নীচু হয়ে বসে' নিজের উদর থেকেই বুঝি পান করছে ও? তবু ভুরু কুঁচ্‌কে আমাকে দেখ্‌ছে, সারা গাত্র ওর নিঃশব্দ হাসির আলোড়নে কাঁপ্‌ছে আমার মায়াবী চিন্তাস্রোত দেখে।

বনের সবখানে মর্ম্মরধ্বনি জেগেছে, পশুগুলি জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। পাখীর পরস্পরকে ডাকাডাকি করছে, ওদের ইসারায় বাতাস যেন ভরে' গেল। মে-বাগ্ পাখীর বিদায় নেবার তারিখ এল, ওর অস্পষ্ট গুঞ্জন রাতের পোকার গুন্‌গুনানির সঙ্গে মিশে গেছে—যেন বনের আনাচে কানাচে ফিস্‌ফিসিয়ে আলাপ চলেছে কাদের। এত শোন্‌বার রয়েছে এখানে। দিনরাত আমি ঘুমুইনি—খালি ডাইডেরিক আর ইসেলিনের কথা ভেবেছি।

ভাবি, "হয়ত ওরা এসে পড়্‌বে।" ইসেলিন্ ডাইডেরিককে

হয়ত একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে বল্‌বে—"খাড়া থাক এখানে, পাহারা দাও। এই শিকারীকে দিয়ে আমি আমার জুতোর ফিতে বেঁধে নেব।"

সেই শিকারী ত' আমিই আমার দিকে এমন ক'রে ও চাইবে যে, সে দৃষ্টির মানে আমি বুঝব। কখন সে আসে আমার হৃদয় তা জানে, তখন হৃদয় আর দোলে না, ঘণ্টার মতো বেজে ওঠে। ওর পোষাকের তলায় পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আগাগোড়া ও নগ্ন, ওর গায়ের ওপর আমার হাত রাখি।

'জুতোর ফিতে বেঁধে দাও।" রাঙা গালে ও আমাকে বলে। খানিকবাদে আমার মুখের, ঠোঁটের কাছে ওর মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে—'বাঃ তুমি আমার জুতোর ফিতে বাঁধ্‌ছনা, তুমি বাঁধ্‌ছনা, বাঁধছনা আমার..."

কিন্তু সূর্য্য সমুদ্রে ডুবে ফের লাল তাজা হয়ে ওঠে, যেন জল খেতে ডুব দিয়েছিল। বাতাস অস্ফুট গুঞ্জরণে ভরা।

একঘণ্টা বাদে মুখের কাছে এসে ফের বলে—"এবার তোমাকে ছেড়ে চল্লাম।" ফিরে ফিরে আমার পানে হাত নাড়ে, মুখ ওর তখনও রাঙা, কোমল, খুসিতে উছ্‌লে উঠেছে। আবার সে ফেরে, আবার হাত নাড়ে।

কিন্তু ডাইডেরিক গাছের তলা থেকে বেরিয়ে এসে শুধোয়—"ইসেলিন, কি করেছো? আমি ত' দেখে ফেলেছি।"

ইসেলিন বলে—'কি দেখ্‌লে? কিছুই করিনি ত'।"

"দেখেছি, কি করেছ।' সে ফের বলে—"দেখে ফেলেছি।"

ইসেলিনের হাসির তরঙ্গ বনে বনে প্রতিধ্বনিত হয় তারপর, ডাইডেরিকের সঙ্গে যায়,—ওর সর্ব্বদেহ আতুর, আনন্দে হিল্লোলিত হচ্ছে। কোথায় চলেছে ও? আর কোন্ মৃত্যুপিপাসু মানুষের দুয়ারে, কোন্ বনের শিকারীর কাছে!

মাঝ রাত। ঈশপ দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে নিজের মনে শিকার খুঁজছে। পাহাড়ে পাহাড়ে ওর চীৎকার শুন্‌লাম। ওকে যখন পাক্‌ড়াও করলাম, রাত তখন একটা। একটি মেয়ে ছাগল চরিয়ে আস্‌ছে, পায়ে মোজা বাঁধা, গুন্‌গুনিয়ে সুর ভাঁজছে আর চারদিক চাইছে। বনে এই মাঝরাতে কি করছিল ও? না না, কিছুই না, কিছুই না। অস্থির হয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল বুঝি, হয়ত বা সুখেই, কে জানে? ভাবলাম নিশ্চয় ও বনে বনে ঈশপের আর্ত্তনাদ শুনেছে, আর নিশ্চয় ভেবেছে—আমি বাইরে বেরিয়েছি।

কাছে আস্‌তেই দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইলাম—ভারি পাৎলা টুক্‌টুকে মেয়েটি! ঈশপও দাঁড়িয়ে ওকে দেখ্‌ছে।

'কোথা থেকে আস্‌ছ?' শুধোই।

'কারখানা থেকে।" মেয়েটি বলে।

কিন্তু এত রাতে কারখানায় ও কী কাজ করে?

"এত রাতে বনে বেরিয়ে আস্‌তে ভয় করে না তোমার?" বলি—"তুমি এত হাল্কা, এত ছোট্টটি।"

মেয়েটি হাসে, বলে—"আমি আর ছোট্টটি নই—আমার বয়স উনিশ।"

কিন্তু উনিশ ও হ'তে পারে না, নিশ্চয়ই দু'বছর মিথ্যা করে বেশি বল্‌ছে, ও মোটে সতেরো। বয়েস ভাঁড়িয়ে ওর কি হবে?

বলি—"বোস, তোমার নাম কি?"

ও আমার পাশে বসে' লজ্জায় একটু রাঙা হ'ল, বল্‌ল—ওর নাম হেন্‌রিয়েট্।

শুধোই—'তোমাকে কি কেউ ভালোবাসে হেন্‌রিয়েট্? সে কি তোমাকে কখনো বাহুর মাঝে নিয়ে জড়িয়েছে?"

"হাঁ।" লজ্জায় একটু হাসে মেয়েটি।

"ক'বার?"

মেয়েটি কথা কয় না।

"ক'বার?" আবার শুধোই।

"দুবার।" আস্তে বলে।

তাকে টেনে আন্‌লাম বুকের কাছে। বলি—"কেমন করে' জড়াত? এমনি ক'রে?"

'হাঁ!" ও ফিস্‌ফিস্ করে' ভয়ে ভয়ে বলে।

তাড়াতাড়ি চারটে বাজে।

—০—

বাংলার মেয়ে

শ্রীসুনীতি দেবী

তুমি আমায় বাসবে ভাল ব'লে—
জন্ম নিলাম বঙ্গমাতার কোলে।
অষ্ট্রেলিয়া, চীন কি দূর জাপান,
ভারত মাঝেও ছিল কত স্থান,
আমেরিকা নূতন মহাদেশ
মনে আমার ধরেছিল বেশ,
ইংলণ্ডের স্বাধীনতার টানে,
ঝুঁকেছিলাম বারেক সে দিক পানে,—
কোথায় যাব ভাবছি থাকি থাকি,
তোমার দিকে পড়ল হঠাৎ আঁখি,—
ভয় ভাবনা অমনি গেল টুটে,
তোমার দেশে চলে এলাম ছুটে।
বাংলা দেশের নিঝুম পাড়াগাঁয়ে,
পুকুর-ধারে অশথ-বটের ছায়ে
ব'সে থাকি এলিয়ে দিয়ে চুল,
কখনও বা খোঁপায় গুঁজি ফুল।
নীলাম্বরীর আঁচল টেনে বুকে
তোমার স্বপ্নে ডুবে থাকি সুখে।
মল বাজিয়ে, চোখে কাজল দিয়ে,
সকাল সাঁঝে কলসী কাঁখে নিয়ে,
তোমার তরেই করি আনাগোনা
ভাবি কখন বাঁশী যাবে শোনা।

জানি তুমি আস্‌বে শুভদিনে,
এক নিমেষে আমায় নেবে চিনে,
গলায় প'রে নেবে আমার মালা,
জুড়িয়ে দেবে অনেক দিনের জ্বালা।
আমায় তুমি বাস্‌বে ভালো তাই,
বাংলা মায়ের বুকে নিলাম ঠাঁই।

———

লেখা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

লেখা জিনিষটে আমার অতিশয় প্রিয়। যদি তা না হত তাহলে আমি একজন লেখক হয়ে উঠতুম না। কারণ লেখবার প্রবৃত্তি না থাক্‌লে লেখক হওয়া যায় না। আর অপর দেশে যাই হোক বাঙলাতে আজও শুধু ঐ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই লোকে লেখে। এই কারণে নতুন লেখকের আবির্ভাব আমার মনে উৎসাহের সঞ্চার করে।

বাঙলা ভাষা আমরা সকলেই ভালবাসি এবং সেই কারণে সকলেই চাই যে তার শ্রীবৃদ্ধি হোক্। এ উন্নতি সাধন করা পাঠকের সাধ্য নয়; সাধ্য এক মাত্র লেখকের। পাঠকের দলের কাছে ভাষা যে তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য দায়ী নয় তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা ইংরাজী লেখা বই দেদার পড়ি; কেননা তা পড়্‌তে বাধ্য হই, অথচ এ দাবী আমরা কেউ করতে পারি নে যে, আমরা ইংরাজি ভাষার উন্নতি সাধন করছি।

আমরা যাকে উন্নতি বলি তাও আসলে সৃষ্টির একটা অঙ্গ। যাকে আমরা সৃষ্টি বলি তার কর্ত্তা যে, হয় প্রকৃতি, নয় পুরুষ আর তার উন্নতির কর্ত্তা মানুষ—এ রকম কথা এ যুগে কোনও দার্শনিকই বলেন না। সৃষ্টির ধারা খণ্ড খণ্ড নয়, অনন্ত এবং এক। সুতরাং ভাষার উন্নতি-সাধনের অর্থ হচ্ছে তাকে নবকলেবর দান ক'রে তার প্রাণ রক্ষা করা। কথাটা দার্শনিক হলেও সত্য।

এখন ভাষার নবকলেবর দান করতে পারেন কে? অবশ্য পাঠক নন—লেখক। কারণ পাঠক হচ্ছেন সাহিত্যের ভোক্তা মাত্র, তার কর্ত্তা হচ্ছেন লেখক। ইকনমির ভাষায় বলতে হলে লেখককে producer বল্‌তে হয় আর পাঠককে consumer. আর লেখক যা produce করবে পাঠক তাই consume করতে বাধ্য – কারণ কোন কিছু produce করা তার ধর্ম্ম নয়। ভাষাকে নবকলেবর দিতে পারে শুধু নতুন লেখক। লেখক হিসেবে নতুন হলেই তার লেখা নতুন হয় না। নতুনের প্রধান পরিপন্থী অতীত নয়—বর্ত্তমান। কারণ সে

অতীত বর্ত্তমানে রূপান্তরিত হয় নি তারও কোনও শক্তি নেই—কেননা তা মরা অতীত। এ কথা বলার উদ্দেশ্য নতুন লেখকদের এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, বর্ত্তমান পুরোনো লেখকদের মায়া কাটাতে না পারলে তাঁরা নতুন লেখক হতে পারবেন না। ধরুন আমাকে যদি পাঁচজন লেখক বলে মান্য করে তাতে অবশ্য আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করি; কিন্তু আমি এ মনোভাবের সাক্ষাৎ পেতে চাই পাঠকের মনে—লেখকের মনে নয়। যে লেখক মনে মনে আমাদের লেখক হিসেবে বাতিল করে দিতে না পারেন তাঁর লেখায় তাঁর স্বধর্ম্ম ফুটে উঠবে না; আর তার ভিতর ভাবের ও ভাষার নূতন চেহারা দেখতে পাব না। নূতন লেখকের জপমন্ত্র হওয়া উচিত সোঽহং। যে লেখকের মনে এ ধারণা নেই তিনি সাহিত্যের আসরে হবেন শুধু দোহার, মূল-গায়েন নয়। আর যার মনে এ ধারণা আছে তিনি হবেন হয় নূতন লেখক নয় অ-লেখক। অ-লেখক হবার ভয় যার আছে তাঁর কলম ধরা উচিত নয়।

আমার কথা যে ঠিক তার প্রমাণ স্বরূপ সমাজের আর একটি ক্ষেত্র থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সাহিত্য বস্তু যে কি তা সকলে জানুন আর নাই জানুন, পলিটিকস্ যে কি, আবালবৃদ্ধবণিতা জানে। আর এ ক্ষেত্রে নবপলিটিসিয়ানরা যদি সুরেন্দ্রনাথকে বাতিল করে দিতে না পারতেন তাহলে তাঁরা এ যুগের সব বড় বড় পলিটিসিয়ান হতে পারতেন না। আর পুরোনো পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে নতুন পলিটিসিয়ানদের প্রভেদ কোথায়?—এক মাত্র কথা কইবার ভঙ্গীতে। অর্থাৎ নবপলিটিসিয়ানরা পলিটিক্সের একটা নবরীতির, অর্থাৎ—style-এর সৃষ্টি করেছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, নূতন লেখকরা পুরোনো লেখকদের বাতিল না ক'রে দিলে সাহিত্যের নবরীতির সৃষ্টি করতে পারবে না। আর নবরীতি গড়তে পারলে পাঠকেরও অভাব হবে না। তেড়েফুঁড়ে লিখতে পারলে পাঠক সমাজ বলবে, "জীতা রও তোম্‌ভি মিলিটারি।" আমার কথা আমি স্পষ্ট করে বলতে পেরেছি কি না জানিনে; কিন্তু আসল বক্তব্য এই যে, নূতন লেখকদের কাছ থেকে এই আশা করি যে, তাঁরা বাংলা সাহিত্যের একটি নব পর্য্যায়ের সৃষ্টি করবেন, কারণ তাঁরা যদি তা না করেন তাহলে বঙ্গ-সরস্বতী যেখানে আছেন সেইখানেই থেকে যাবেন, এক পাও অগ্রসর হতে পারবেন না।

নূতন লেখকেরা পুরোনো লেখকদের মুখাপেক্ষী না হইলেই যথার্থ নূতন লেখক হয়ে উঠবেন। * * *

—লেখা

আগামী কাল

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র.

দুপুরের রোদে সমস্ত ধূধূ করে।

বাদামতলার মোড় থেকে দেখা যায় দাক্ষণে বাঁঝা মাঠ আকাশের কিনারায় গিয়ে ঠেকেছে :—বিশাল তপ্ত তাওয়ার মত, তা থেকে আগুনের হল্কা ওঠে।

শুধু দূরে দেখা যায় একটি নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী দগ্ধ তাম্র মাটি হতে উঠছে, বুঝি শুকনির ইটখোলার পাজা থেকেই।

ও যেন ক্লান্ত অবসন্ন পৃথিবীর দিবাস্বপ্ন।

যে পাকা শড়কটা বাদামতলার মোড় থেকে বল্লমের মত সোজা গিয়ে আকাশের ঝালরে বিঁধেছে তারই ওপর দিয়ে শুকনির টালি-খোলা থেকে ধূলির পুচ্ছ উড়িয়ে মোটর লরি আসে উর্দ্ধশ্বাসে 'মেসোজোইক' যুগের যেন কোন্ অতিকায় হিংস্র সরীসৃপ যুগযুগান্তরের নিদ্রা হতে হঠাৎ জেগে উঠেছে।

হঠাৎ চীৎকার ওঠে, হা-হা—গেল—গেল!

পথের শুক্‌নো ধুলোয় আর রক্তে মাখামাখি হয়ে যায়। সজীব দেহটা একপলকে অসাড় মাংসপিণ্ডের মত হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে থাকে।

মোটর লরিটা হঠাৎ বেগ সংবরণ করে রুদ্ধ রোষে যেন গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে হাঁফায়। ওইটুকু প্রাণীকে চট্‌কে পিষে থেৎলে মেরে ওর যেন আশ মেটে নি। চাকাগুলো যেন ওর থাবা!

দুপুর হলেও লোকে ভিড় করে দাঁড়ায়।

"কার ছেলে? কার ছেলে?"

কেউ জানে না কার ছেলে! অনেক খোঁজ করেও পাত্তা মেলে না।

নতুন লোক এসে ভিড় ঠেলে মাথা ঢুকিয়ে দেখে, আবার জিজ্ঞাসা করে, "আহা কার বাছা গো?. কার কোলপোছা ধন—পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছিল গো!"

কার ছেলে কে জানে!

হয় ত ও কারো ছেলে নয়।

হয় ত ও মাটির সমস্ত ছেলের প্রতীক। ওর পায়ে মাটির মমতার বেড়ি।

সে টীনের চৌচালা আর নেই। তার জায়গায় পাকা দোতালা উঠেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লীলা বলে, "আর পারি না বাপু, টানাপড়েন করতে, এর চেয়ে সে টীনের চালা আমার ভাল ছিল!"

বিপিনবাবু হেসে বলেন, "তোকে কে টানাপড়েন করতে বলেছে মা? তুই চুপ করে' বসে' থাক্ না, সব ঠিক হয়ে যাবে এখন। ঝি রয়েছে, ঠাকুর রয়েছে, ওরাই করুক না!"

পোনেরো বছরের মেয়ে গিন্নির মত বলে, "হ্যাঁ, আমি বসে থাকি, আর ঘরসংসার সব চোলোয় দোরে যাক আর কি? আমি একদণ্ড বসলে চলে!"—চাবীর গোছাবাঁধা আঁচলটা কাঁধের ওপর ফেলে অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে এক এক ধাপে দুটো সিঁড়ি পার হয়ে লীলা ওপরে উঠে যায়।

সস্নেহ হাসিতে বিপিনবাবুর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

আবার দুর্ দুর্ করে লীলা সিঁড়ি দিয়ে নামে। অপরিপাটি খোঁপাটা মাথায় অগোছাল ভাবে ঝুলে আছে। শেমিজটা আধ-ময়লা, তার উপর ধোপদস্ত শাড়ির আঁচলটা কোথায় লেগে ছিঁড়ে ওড়ান হয়ে গেছে।

গিন্নিবান্নিদের ওসব বুঝি ভ্রূক্ষেপ করতে নেই! হয় ত সমবয়সী নারীর সঙ্গবিহনে তার কিছু শেখবার সুযোগ হয় নি।

দুর্ দুর্ করে, নীচে নেমে লীলা বাবাকে একবার তাড়া দেয়, "তোমার তেল মাখা হল বাবা, কখন্ নাইবে আর কখন খাবে বল' ত!" বাইরের ঘরের বন্ধ দরজার দুয়ারে ধাক্কা মেরে আবার কাকে বলে, "আর কল ঘটর ঘটর করতে হবে না। জামাকাপড় ছাড়' দেখি। ঠাকুর যে রেঁধে একঘণ্টা বসে আছে।"– এবং পর মুহূর্ত্তে রান্নাঘরে গিয়ে শ্রমারক্তমুখে ঠাকুরকে ধমক দেয়, "একটু হাত চালিয়ে কাজ করতে পার না ঠাকুর!'

পোনেরো বছর বয়স হলেই বা, তার ওপর সংসারের সব ভার ত'!

খানিক বাদে আবার বাইরের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। ভেতরে টাইপ রাইটারের শব্দ তখনো তেমনি চলেছে। দরজাটা ঝপাৎ করে' খুলে' ভিতরে গিয়ে বলে, "এখনো উঠলে না ত! দাঁড়াও।"

যে টাইপ রাইটিং করছিল সে ফিরে' চায়।

ফ্যাকাশে রোগাটে মুখে দুটি করুণ নীল চোখ, মাথায় পাৎলা লম্বা চুলগুলি কপাল ঝাঁপিয়ে যেন চোখে পড়তে চায়—ঠোঁটে অত্যন্ত স্নিগ্ধ ম্লান একটু হাসি।

"এটা যে বড্ড জরুরি চিঠি!"—ছেলেটি মিনতির সুরে বলে, "বিলাসবাবু রাগ করবেন।"

"হোক্ জরুরি চিঠি, খেয়েদেয়ে ও-কাজ করলে আর সৃষ্টি রসাতলে যাবে না।"

"আচ্ছা এই লাইনটা।"

"তবে এই যাক তোমার চিঠি চুলোয়।"—চাবিগুলো যেখানে সেখানে লীলা টিপে দেয়। তার পর বলে; "কি হল দেখি এবার—বি এল্ টি ইউ ওক্স। নাও ওঠ।"

ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়—ঢ্যাঙা, রোগা, একটু কুঁজোই হবে বোধ হয়।

"আমি কিন্তু বকুনি খাব।"

"তা খেয়ো, কিন্তু তার আগে ভাত খেয়ে নাও।

ছেলেটি একটু হাসে। জামাটা খুলে' বলে, "তেল কোথা?"

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ছেলেটির চুলগুলি গুছি করে' ধরে লীলা চোখ দুটি বড় বড় করে' বলে, "তোমায় না কাল চুল কাটাতে বলেছিলাম অনিল-দা? ওমা এই বড় বড় চুল এখনো কাটো নি—এতে আর অসুখ হবে না! যাও শীগ্গীর চুল কেটে এস।"

পোনের বছরের মেয়ের গিন্নিপনার ভঙ্গীটি ভারি মিষ্টি নয় কি?

অনিল একটু হাসে, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে সুবোধ শান্ত ছেলের মত বেরিয়ে যায়।

—আবার রান্নাঘরে।—

ঠাকুর বকুনি খায়, ঝির ভাগ্যে ধমক জোটে। কেউ কোন কাজের নয়, যে দিকটা লীলা না দেখবে সেই দিকটাতেই সবাই সব কাজ পণ্ড করে' বসে' থাকবে!

মাঝে মাঝে তবু বলতে হয়, "না! ওঠানামা করে, পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল! আর পারি না বাপু!"

"ও বাবা, এখনো তোমার চান হ'ল না?

"দেখি অনিল-দা', কি রকম চুল কেটে এলে। ওমা, সামনে ওই অত বড় বড় চুল রইল! আচ্ছা আজ থাক্, কাল কিন্তু আবার কাটাব।"

"হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি বামুন, না কি? আঁশ-সকড়ির বিচার নেই! সকড়ি হাতটা না ধুয়েই নূনের বোয়েমে দিলে!"

গয়লানি দুধ দিতে এসে হয় ত বলে, "হ্যাঁ মা, এ কি ছিরি হয়েছে গো! বাড়ীর গিন্নিবান্নিই না হয় নেই, নিজেও কি একটু সময় করে চুলটা বাঁধতে গাটায় সাবান দিতে নেই!"

চাবী বাঁধা আঁচলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে কোমরে জড়িয়ে লীলা বলে, "তুমি থাম বাপু, গায়ে সাবান দেব!

আমার বলে মরবার সময় নেই। ও ঝি, বুড়ো হয়ে মরতে গেলে, এখনো আক্কেল হল না! খাবার জলের গেলাস কি পায়ের বাঁ ধারে দেয়!"

লীলা ঝিয়ের ভুল শোধরাবার কাজে লাগে।

অনিল হাসে, বিপিনবাবু হাসেন, বুড়ি ঝিও একটু হাসে।

সবার অলক্ষ্যে একটি লোক বাড়িতে ঢোকে—শুক্‌নো খোসা ওঠা মুখ, কোটরে ঢোকা চোখ, রোগা মুখে খাঁড়ার মত নাকটা পাখীর ঠোঁটের মত দেখায়। এই সমস্ত হাসাহাসির পিছনে নীরবে সে খানিকক্ষণ দাঁড়ায়, তারপর নিঃশব্দ চরণে বাইরের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

হয় ত সংসারের এই সব তুচ্ছ হাসি, আনন্দের কোন মূল্যই তার কাছে নেই।

তাই বোধ হয় সে অবজ্ঞায় দূরে সরে' থাকে!

ব্যাঙের ছাতার মতই বাড়ী গজায় বটে দিনের পর দিন, এখানে সেখানে, রাস্তার ধারে ধারে।

বাড়ী গজায় বটে কিন্তু কেমন যেন বাড় নেই তাদের, কেমন যেন শ্রীহীন কাঙাল চেহারা। তারা যেন শুধু মানুষের মাথা গোঁজবার আশ্রয়, হাত পা ছড়াবার, প্রাণ মেলবার জন্যে নয়।

কিন্তু বাড়ী ওঠে। সারা দিনরাত অক্লান্ত ভাবে শহর যেন একটু একটু করে' এগোয়—সারাদিন এদিকের শহরতলির আকাশ মজুরদের ছাদ পেটানোর শব্দে গানে গম্‌গম্ করে।

ছোট ছোট দোতালা আর একতালা, কোনটা বা কায়ক্লেশে তেতালার চিলকোঠা পর্য্যন্ত ওঠে। কোনটার গায়ে বালিকাজ আর হয় না, ন্যাড়া ইটগুলো দাঁত বার করে' থাকে। শহরের সমৃদ্ধির স্রোতটা বুঝি এ দিক দিয়ে গেল না। একটি ক্ষীণ ধারাতে বুঝি মাটি একটু সরস হয়ে ওঠে মাত্র। তাতেই এই নিস্তেজ রুদ্ধবৃদ্ধি দোতালা আর তেতালাগুলি মাথা তোলে সারের পর সার।

আমেরিকার দেওয়া পাট, চামড়া ও গমের দামটা যায় কোথায়?

হয়ত স্পেনের আঙুরের ক্ষেতের সার জোগাতে।

হয় ত আমেরিকাতেই ফিরে যায়—মোটরের কারখানায়—

চীনের দেওয়া কাঁচের দামটা বোধ হয় রেশম হয়েই ফেরে।

তবে শুধু তাই নয়, পুরোণো শহরের রাস্তাগুলোও চওড়া হ'য়ে ওঠে। মহাজনদের পাড়ায় ইমারতের আড়ালে দিন দুপুরে সূর্য্য অস্ত যায়।

আর এ দিকেও সুবোধবাবুর নতুন বাড়ী ওঠে।

দালানটা বাঁকা—তা হোক! কোণের ঘরটা একটু অন্ধকার—তা যাক। মানুষ মাথা গুঁজে ত থাকতে পারে। ফাঁকা মাঠের চেয়ে ত ভাল পাতার ঘরের চেয়ে ত ভব্য!

ভব্য!

এ শহরতলির দেবতা,—জীর্ণ নির্জীব ভব্যতা! সে দেবতা নিজের মুখ নিজে সাহস করে' দেখে না; অন্তর বাহিরের দারিদ্র্যকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে ভিড়ের তালে পা ফেলে চলবার বৃথা চেষ্টায় পদে পদে হোঁচট খায়। বড় নয়,—ছোট খাট মিথ্যার বোঝায় দিন তার দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে।

সুবোধবাবু সামনের বড় হুঁচল দাঁতটি সরু মুখের আগায় সঙিনের মত উঁচিয়ে একটু হাসির চেষ্টা করে' বলেন, "ব'ন্‌ল না মশাই, মিস্ত্রীদের সঙ্গে ব'ন্‌ল না! বল্লাম,—থাক তবে বেটা আমার বাড়ী দাঁত বার করে'ই থাক, তবু তোদের দিয়ে কাজ করাব না—সেই থেকে আর বালিকাম করাই নি।"

সুবোধবাবু নতুন বাড়ীতে বালিকাম পর্য্যন্ত আর কুলিয়ে উঠতে পারেন নি।

রাস্তার অপর পারের একতালা বাড়ী থেকে পরণের কাপড়টি লুঙির মত করে' পরে' অজীর্ণ রোগের ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যিনি আলাপ করতে এসেছেন তাঁর বাড়ীতে বালি ও চুণকাম দুই-ই হয়েছে।

সুতরাং তিনি পেছনে হাত দিয়ে মুখটা তুলে' বাড়ীটা আর একবার পর্য্যবেক্ষণ করে' নাক একটু সিঁটকে

না বলেই পারেন না, "কিন্তু দেখায় যে বড় খারাপ!"

সুবোধবাবু চটেন, একটু বিব্রত হন বোধ হয়; কিন্তু বাইরে হেসে বলতে হয়, ও "বাইরেটা দেখতে ভাল আর মন্দ! খোসা দেখব, না শাঁস খাব বলুন? আমি মশাই খোসার চেয়ে শাঁসই বুঝি!"—তারপর একটু পাল্টা আঘাত, বিনয়ে মধুর করে'—"ক'দিনই ত আপনাকে বলছি, আসুন না একটু পায়ের ধূলো দিন্ না উপরে, দেখবেন কি হাওয়া আর কি চমৎকার 'ভিউ'—আপনাদের একতালা বাড়ীর ওই সুখটি নেই মশাই। আপনি দোতালা না করে' অমন একতালা করলেন কেন?"

একতালার সুবোধবাবু খুঁজেপেতে বোধ হয় একতালা বাড়ী করলেও যে ভব্যতা নষ্ট হয় না তার প্রমাণ দেন।

এমনিতর সুবোধবাবুদের বাড়ী ওঠে ব্যাঙের ছাতার মত শহরতলির রাস্তার ধারে ধারে।

এমনি করে সুবোধবাবুদের দিন যায় হাস্যকর মিথ্যার পর্দায় নিজের ও পরের কাছ থেকে ব্যর্থ জীবনের সকল রকম দৈন্যকে আড়াল করবার অর্থহীন চেষ্টায়।

কিন্তু এই সুবোধবাবুরাও শহরের সমৃদ্ধির স্রোতের জন্যে নিঃশব্দে খাত খনন করে। এই সুবোধবাবুদের সামনে রেখেই শহর আপনাকে প্রসারিত করে। শহর যেখানে পা বাড়ায় সেখানে সবার আগে বাড়ী ওঠে সুবোধবাবুর।

সুবোধবাবুর বাহিকাম হয় নি বাইরে। না হোক, ভিতরে চুণকাম আছে। ছোট্ট হোক, দুজনার বেশ। তিনজনের বসবার জায়গা না কুলোক, বাইরের ঘর আছে একটি। নতুন পালিশ করা পুরোনো নীলেমে-কেনা টেবিল, হাতল ভাঙ্গা চেয়ার দুখানা—কোন রকমে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে আছে। দেয়ালময় অবর্ত্তমান বর্ত্তমান বহু বৎসরের ক্যালেণ্ডারের ছবি।

সুবোধবাবু বাড়ী দেখাতে দেখাতে বলেন,—"এই যে নীচের আর দুটি ঘর দেখছেন, একটু আলো কম মনে হচ্ছে কি?"

বিনয়ী নিমন্ত্রিত বলেন,—"না তেমন আর কি?"

অন্ধকারটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না,—সুবোধবাবু বলেন, "কিন্তু ভারী 'কুল'—গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলা শুয়ে আরাম।"

ঘরগুলোর অন্ধকারের দোষ এইবার কেটে যায়! ওগুলোতে যে গরম কালে দুপুর বেলা শুয়ে আরাম, তৈরীও বোধ হয় সেই জন্যে! কিন্তু সুবোধবাবু অতটা বলেন না।

দোতালায় ওঠবার সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুবোধবাবু নিজে থেকে বলেন,—"সিঁড়ি, মশাই, চওড়া করা আমি পছন্দ করি না, মিছামিছি জায়গা নষ্ট, এই ত আমরা দেড় ফুট চওড়া বাঙালী, আমাদের আবার বেশী চওড়া সিঁড়িতে কি হবে, কি বলেন?"

তা বটেই!

দোতালায় ওঠা হয়।

"কি সাইন ভিউ' দেখুন ত এখান থেকে!"—সভান দাঁতটি নীচের ঠোঁটের ওপর নামিয়ে এনে ভাবাবেশে খানিক সুবোধবাবু তন্ময় হয়ে থাকেন তারপর চমক ভাঙতে বলেন,—"নেচার-এর বিউটি' এমন মনকে মুগ্ধ করে!"

বিনয়ী নিমন্ত্রিতকেও বোঝা যায় 'নেচার'-এর 'বিউটি' মুগ্ধ করেছিল। তিনি বলেন—"সত্যি বড় চমৎকার ভিউ ত!"

সুবোধবাবু নেচার এর 'বিউটি'র প্রসঙ্গ আর একটু দীর্ঘ করতে চান,—কি সুন্দর বলুন ত, যতদূর দেখা যায় মাঠের পর মাঠ আকাশ গিয়ে ছুঁয়েছে—কিন্তু আর বেশী কিছু খুঁজে পান না। সুতরাং,—"দেখলে ভগবদ্ভক্তি আপনি আসে, কি বলেন?" —ব'লে শেষ ক'রে অন্য প্রসঙ্গ ধরেন।

বাঁকা হোক টেরা হোক ওপরের ঘর ক'টিও দেখা যায় স্থাপত্য শিল্পের চরম না হোক, পরম উৎকর্ষের নিদর্শন।

সুবোধবাবু নিজের উদ্ভাবিত জানলার ছিটকিনির নতুন কৌশলটা ব্যাখ্যা করেন, ঘরের নর্দমার ঢালুতার প্রশংসা করেন এবং বাজে কাঠের সস্তা জানলার কবাটগুলো যে শুধু ছেলেদের দৌরাত্ম্যেই ফেটে ও ফাঁক হয়ে সস্তার মত দেখায় তা বিশদভাবে জানান।

দু'ঘরে দুটি তক্তপোষ পাতা এবং একটি ঘরে একটি

ব্যাশিং-ওঠা খাট ; তক্তপোষ ও খাটে ময়লা বালিশ ও চাদর থাকায় বোধ হয় ভব্যতার হানি হয় না। বিছানা পত্র অপরিষ্কার থাকা অবস্থায় বাড়ী দেখতে কাউকে নিমন্ত্রণ করাটা সমীচীন হয়েছে কিনা মনে মনে সুবোধবাবুকে খানিকক্ষণ বিচার করতেই হয়। ময়লা বিছানার চিন্তাটা থেকে থেকে মনকে খোঁচা দেয়।

বলেন,—"আসবাব পত্র যে বড্ড বেশী, জায়গা করে উঠতে পারি না।"

ঘরে স্থানের অভাব বটে, প্রতি ঘরেই তক্তপোষ বা খাট ছাড়া টীনের কাঠের বা ইস্পাতের রঙ চটা ও রঙ বিহীন বাক্স ও তোরঙের স্তূপ, তা ছাড়া আলনায় কাপড় জামা ছাতা ও জুতা আছে, তাকে বাসন আছে, হরেক রকমের শিশি বাক্স গেলাস ও খেলেনা আছে। এই পরিবারটি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে উদ্বর্ত্তনের পথে সংগৃহীত কোন উপকরণ যে ফেলে এসেছেন এ কথা মনে হয় না।

সুবোধবাবু ঘরের ছবিগুলোর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,—"ছবিগুলোর একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করছেন কি ?"

বিনয়ী নিমন্ত্রিত সুবিবেচকের মত চুপ ক'রেই থাকেন।

সুবোধবাবু বলেন,—"এক এক ঘরে এক একটা গ্রুপ করেছি, বুঝেছেন ? এই ঘরে এই বাঁ ধার থেকে দেখুন, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে শেষ পর্য্যন্ত পরের পর ছবি। ও ঘরে অমনি শ্রীরামের। কেমন 'আইডিয়াটা' ভাল নয়? এই ছবি জোগাড় করতে কি কম হায়রাণ হতে হয়েছে মশাই! ঠিক পরের পর ছবি চাই—"

বিনয়ী নিমন্ত্রিত ঘাড় নেড়ে জার্ম্মাণীর ছাপা ছবির তারিফ করেন।

তৃতীয় ঘরের ছবির গ্রুপের কথা আর সুবোধবাবু উল্লেখ করেন না।—সে ঘরে গ্রুপটা এখনো ভাল করে দানা বাঁধে নি।—সে ঘরে রাজা রাণীর ছবি আছে, বিষ্ণুর অনন্ত শয্যা আছে, আবার অর্দ্ধ উলঙ্গ রবিবর্ম্মার তিলোত্তমাও আছে।

এইবার তেতালা।

সুবোধবাবুর গতি হঠাৎ অত্যন্ত ধীর হয়ে আসে। তেতালায় একটি মাত্র ঘর। সুবোধবাবু জুতো খুলে নিঃশব্দে শিকলি খোলেন।

বিনয়ী নিমন্ত্রিতও দেখাদেখি জুতো খোলেন। সুবোধবাবু গোপনসংবাদ জানাবার মত অত্যন্ত অস্পষ্টস্বরে বলেন,—"ঠাকুর ঘর।"

বিনয়ী নিমন্ত্রিত মুখে ভক্তি ও সম্ভ্রমের ভাব আনবার চেষ্টা করেন।

সুবোধবাবুর কথা সুরু হয়,—"সিংহাসনটি দেখছেন—কোথাকার বলুন ত ? একেবারে খোদ দ্বারকা থেকে আনা। আর এই ঘণ্টাটি হচ্ছে কামাখ্যার! তা আপনাদের আশীর্ব্বাদে এই বয়সে ভারতবর্ষের এধারে ওধারে কোন তীর্থ আর বাকী নেই।"

তারপর একটু হেসে,—"এই কোশা কুশি কমণ্ডলু ধূপদানি—এসব কাশী থেকে আনা, আর এই চামরটায় হাত দিয়ে দেখুন না, সত্যিকারের চমরীর লোমে তৈরী, নেপালে পশুপতিনাথ দেখতে গিয়ে এক নেপালির কাছে কিনে এনেছিলাম। বাজারে সব নকল। এমন হয়ে গেছে মশাই এই ঠাকুর ঘরটিতে না বসলে আমার পুজোই হয় না, তা ছাড়া যে এঘরে এসেছে সে-ই বলেছে এঘরে কেমন একটি যেন শান্তির ভাব আছে, মন যেন আপনি নরম হয়ে আসে—কেমন না ?"

বিনয়ী নিমন্ত্রিত ঘাড় নাড়েন।

"গুরুদেব ত ঘরে ঢুকেই বল্লেন,—তো বেটার ওপর ভগবানের অশেষ কৃপা রে সুবোধ।—বল্লাম,—কেন বাবা পরিহাস করছেন।—বল্লেন,—না রে বেটা, এঘরে যেন শান্তির মন্দাকিনী অনাবিল ভাবে বইছে।—ঠিক ওই কথাটি বলেছিলেন,—যেন শান্তির মন্দাকিনী অনাবিল ভাবে বইছে!"

"খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর সুবোধবাবু বলেন,—সকালে দুটি সন্ধ্যায় দুটি এ দুটি ঘণ্টা আমার এখানে ধরাই আছে, আর তখন যদি বাড়ীর সব পুড়ে ছারখারও হয়ে যায় কারুর এমন সাধ্য আছে আমায় ডাকে!"

বাড়ী দেখা সমাপ্ত হয়। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন কি না বলা যায় না। বলেন,—"বেশ বাড়ীটি!"

অত্যন্ত খুশী হয়ে সুবোধবাবু বল্লেন,—"তাহলে ভাল লাগল! এ সমস্ত নিজের প্ল্যান করা মশাই!"

* * *

মানুষ সহর তৈরী করে। সহর সুবোধবাবু তৈরী করে তার শোধ নেয় কি?

সহরের ছাঁচে মানুষ ঢালাই হয়ে অনেক কিছু হয়। কিন্তু সব চেয়ে বিসদৃশ বুঝি সুবোধবাবু।

প্রকাণ্ড একটা প্রহসনের নায়ক ভুলে গেছে সে অভিনেতা মাত্র।

তবু মনে হয় সুবোধবাবুদের জীর্ণ নির্জীব ভব্য দেবতা কোথায় যেন আপনার নিষ্ফলতায় ক্ষুব্ধ আক্রোশে মাথা চুল ছেঁড়ে।

সেকালে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সখার সাথে ছিলাম যখন আমি
বন-ঘেরা সেই গ্রামখানিতে সুখে;—
কালো আঁধার আস্‌ত যদি নামি'
ভাব্‌না তবু জাগ্‌ত না মোর বুকে!
ছিল সেথায় ফুলবাগানে বকুল-চাঁপা ফুল,
ছিল সেথায় দখ্‌নে হাওয়া আলুল-করা-চুল,
ছিল সেথায় দোয়েল-শ্যামার মিষ্টি গলার তান,
মাঠ-ভরানো দোল-দোলানো 'কনকচূড়ো' ধান।

সখার সাথে ছিলাম যখন আমি,
বাঁশীটি তার কইত কতই কথা!
নিন্দে যদি করত রামী-শ্যামী,
আমার প্রাণে লাগ্‌ত না তায় ব্যথা!
ছিল সেথায় ডালে ডালে কচি আমের বোল,
ছিল সেথায় বকুল-ঝরা ঘাসের নরম কোল,
ছিল সেথায় তালপুকুরে 'ঘাপ্‌টি-মারা' মাছ,
ছায়ার-আসন-পাতা কত বট-অশথের গাছ।

সখার সাথে ছিলাম যখন আমি,
মনের পটে ফুটত আশার ছবি।
পূর্ণিমা যে থাক্‌ত দিবা-যামী
বাদল-মেঘে মিলিয়ে গেলেও রবি।
ছিল সেথায় পদ্মবনে মৌমাছিদের গান,
ছিল সেথায় দীঘির জলে বুনো-হাঁসের স্নান,
ছিল সেথায় চাঁদ-নাচানো ভরা-নদীর বাঁক,
দুপুর-রোদে ঘুম-মাখানো ঘুঘু-পাখীর ডাক।

সখার সাথে ছিলাম যখন আমি,
বন্‌-ঘেরা সেই শ্যামলা গাঁয়ে সুখে,
কাল-বোশেখী আসৃত যদি নামি,
ভাব্‌না তবু জাগ্‌ত না মোর বুকে!

তৃতীয় খণ্ড

রঁম্যা রলাঁ

অনুবাদক—শ্রীকালিদাস নাগ ও শ্রীমতী শান্তা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এমন সময় একদিন সকাল হইতে বৃষ্টি নামিল। দুজনে সেই ঘরখানির মধ্যে যেন বন্দী। একটু পড়া, হাই তোলা, জান্‌লার বাহিরে তাকান, কিন্তু কথা নাই। দুজনেই বিরক্ত সবটা যেন অসহ্য লাগিতেছে। হঠাং বিকালে আকাশটা পরিষ্কার হইয়া গেল। ছুটিয়া দুজনে বাগানে আসিল। প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া দুজনে দেখিতে লাগিল, সবুজ ঘাসের কার্পেট-মোড়া পাড় নদী অবধি গড়াইয়া গিয়াছে, ধরণীর উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস কুয়াসার মত সূর্য্যের দিকে উড়িতেছে। ঘাসের উপর বৃষ্টির কণা ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। ভিজা মাটির গন্ধ ফুলের সুবাসের সঙ্গে মিশিয়া আসিতেছে। একপাল মৌমাছি সোনালী ডানা খেলাইয়া উড়িতেছে। ক্রিস্‌তফ্ ও মিন্‌না পাশাপাশি অথচ কেউ কাহারও দিকে তাকাইতেছে না। দুজনেই যেন ভাবিতেছে—মৌনভঙ্গ করা উচিত কি না। হঠাৎ একটি সবুজ ভিজা ডালের উপর এক ঝাঁক মৌমাছি আসিয়া পড়িল। জল ঝরিয়া দুটি প্রেমিককে অভিষিক্ত করিল চকিতে দুজনে বুঝিল, তাহাদের মধ্যে বিরোধ নাই, রাগ নাই, তারা সেই পুরাতন বন্ধু। দুজনে হাসিয়া উঠিল।

হঠাং মুখ না ফিরাইয়া মিন্‌না ক্রিস্‌তফের হাত ধরিল। এস,—এই ছোট্ট একটি কথা, সঙ্গে সঙ্গে সে ক্রিস্‌তফকে টানিয়া ঝোপের ভিতর দিয়া ছুটিল, খানিক উপরে চড়ে, খানিক নামে, কোথাও ভিজা মাটির উপর পিছলাইয়া পড়িবার উপক্রম। গাছের পাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়ে, মিন্‌না দম লইবার জন্য একটু থামিল, নীচু গলায় শুধু বলিল, দাঁড়াও! ক্রিস্‌তফ্ তাহাকে দেখিল, মিন্‌না অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার মুখে কি এক অপূর্ব্ব হাসি, জোরে নিঃশ্বাস পড়িতেছে, ঠোঁট দুটি অল্প একটু ফুলা, ক্রিস্‌তফের হাতের মধ্যে তার হাত কাঁপিতেছে, সেই হাতে ও কম্পিত অঙ্গুলির ভিতর দিয়া তাহারা অনুভব করিল, তাদের রক্তের মধ্যে যেন কিসের ঝঙ্কার।

চারিদিক নিস্তব্ধ, তরুবল্লরীর পাণ্ডুর অঙ্কুরগুলি সূর্য্যের আলোকে কাঁপিতেছে। টপ্ টপ্ করিয়া পাতা বাহিয়া জল পড়িতেছে। সুদূর আকাশে 'সোয়ালো' পাখীর করুণ ডাক।

মিন্‌না ক্রিস্‌তফের দিকে মুখ ফিরাইল। সে যেন বিদ্যুতের চমক। চকিতে তার হাত দিয়া ক্রিস্‌তফের

গলা জড়াইয়া ধরিল। ক্রিস্তফ্ সে আলিঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িল, মিন্না, আমার প্রাণের—।

ক্রিস্তফ্, ভালবাসি যে—জান ভালবাসি!

একটা ভিজে কাঠের উপর দুজনে বসিল। একটা গভীর মধুর অদ্ভুত ভালবাসায় দুজনে বিভোর, আর যেন সব লোপ পাইয়াছে, বাধা নাই, অভিমান নাই, অহমিকা নাই, শুধু তাহাদের হাসি ও অশ্রু বিচ্ছুরিত চোখের মধ্যে একটি জিনিষ ভাসিয়া উঠিতেছে—ভালবাসা, ভালবাসা!

আকাঙ্ক্ষাভরা একটি মেয়ে, একগুঁয়ে গোঁয়ার একটা ছেলে হঠাৎ এ কি উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিল। ত্যাগ করিতে হইবে, দিতে হইবে, কষ্ট সহ্য করিতে হইবে—প্রিয়তমের জন্য মরিতে হইবে! কই এ পরিচয় ত আগে ছিল না! তাহারা কি আগেকার মানুষ নয়? সবই কি বদলাইয়া গিয়াছে? তাদের চোখে মুখে, হৃদয়ে যেন এক অভিনব দীপ্তি, স্নিগ্ধতা! এই তো জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ। পরিপূর্ণ ত্যাগ, আপনাকে একেবারে উজাড় করিয়া দেওয়া—কি নির্ম্মল, কি পবিত্র এই আত্মদান, এই আত্ম-রতি—ইহজীবনে আর দুইবার আসে না।

ক্রিস্তফ্ ও মিন্না এমনি বিভোর হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়। রুদ্ধকণ্ঠে নবজাগ্রত প্রেমের প্রলাপ—চুম্বন—অসংলগ্ন আনন্দ-কাকলি—হঠাৎ সজাগ হইয়া উঠিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া,—টলিতে টলিতে পড়িতে পড়িতে হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া যাওয়া,—প্রেমে আনন্দে উচ্ছ্বাসে একেবারে দিশেহারা—এমনি ভাবে সময় কাটিয়া যায়।

মিন্নাকে ছাড়িয়া ক্রিস্তফ সোজা বাড়ী ফিরিতে পারে না। সে জানে ঘুম আসা অসম্ভব। শহর ছাড়িয়া সুদূর প্রান্তরে সে চলিয়া যায়। গভীর রাত পর্য্যন্ত পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। অন্ধকার জনশূন্য মাঠ, হাওয়ার মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা—রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্যাঁচা তীব্র কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠে। তবু ক্রিস্তফের হুঁস্ নাই—সে যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটিতেছে। মাঠের পারে দূর শহরের আলোগুলি কাঁপিতে থাকে—মাথার উপর অন্ধকার আকাশে তারার স্পন্দন। পথের ধারে বসিয়া হঠাৎ ক্রিস্তফ্ আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। কেন সে জানে না—এত আনন্দ বুঝি সে সহ্য করিতে পারে না। তার আনন্দের সঙ্গে কোথায় যেন একটা গভীর বিষাদ মিশাইয়া আছে। নিজের আনন্দের জন্য কৃতজ্ঞতায় তার প্রাণ ভরপুর! অথচ পরে যে এই আনন্দ পায় না—অনেক মানুষেই যে এই প্রেমের আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত, ইহা ভাবিতে সমবেদনায় তাহার বুক ভরিয়া উঠে। পৃথিবীর সবই মধুর অথচ সবই ক্ষণভঙ্গুর। অথচ শুধু প্রাণ-ধারণের উন্মাদনা কেমন করিয়া সকলকে মাতাইয়া আছে। সে আনন্দে কাঁদিয়া ফেলে এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ে। হঠাৎ জাগিয়া দেখে উষার রক্তিম রাগে পূর্ব্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত, নদীর বুকের উপর কুয়াশার আবরণ! দূরে অস্পষ্ট ভাবে শহরটি দেখা যাইতেছে। সেখানে মিন্না পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তার সকল অবসাদ পরাস্ত করিয়া অপরিসীম আনন্দের অনুপম দীপ্তি তার চোখে মুখে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

*   *
*

সকালে নানান্ অছিলায় তাহারা আবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা করে। বাগানের মধ্যে তাহাদের প্রেমালাপ চলে। এমনই করিয়া প্রেমের অজানা আবেশ হইতে ক্রমশ দুই জনে সজাগ সচেতন হইয়া উঠিল। মিন্না অনেকটা প্রেমের অভিনয় সুরু করিল এবং ক্রিস্তফ্ একটু বেশী সরল হইলেও খানিকটা নাটকের নায়ক না হইয়া আর থাকিতে পারিল না। তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন লইয়া নানা কথা উঠে। ক্রিস্তফ্ দরিদ্র ও দীন বলিয়া দুঃখ করে, মিন্না মস্ত মহানুভবতা দেখাইয়া বলে, তাতে কি আসে যায়? আমি টাকা চাই না, আমি তোমাকে চাই। সে কথার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে, কারণ টাকা থাকা না-থাকা, দুইটা অবস্থাই তার কাছে হেঁয়ালি মাত্র। যাই হোক্ এই সুযোগে বদান্যতা দেখাইয়া মিন্না বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে। ক্রিস্তফ্ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে সে একজন মস্ত বড় শিল্পী হইবে। মিন্না ভাবে,

চমৎকার! নভেলে তো ঠিক এমনই পড়েছি সুতরাং নভেলী নায়িকার ভূমিকা সে পুরা মাত্রায় অভিনয় করিবার চেষ্টা করে। হঠাৎ সে কবিতা পড়িতে সুরু করিল। ভাবের মাত্রা প্রায় ছাড়াইয়া যায় আর কি! তাহার ছোঁয়াচ্‌ লাগিল ক্রিস্‌তফ্‌কে। সে হঠাৎ পোষাক-আসাক সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতন হইয়া উঠিল। সুতরাং তাহাকে দেখিলেই হাসি পাইত। সে আবার হিসাব করিয়া কথা বলে—মস্ত বড় বড় কথার অবতাড়না করে। মিন্‌নার মা সব লক্ষ্য করেন, মনে মনে হাসেন এবং প্রশ্ন করেন,—ছেলেটা হঠাৎ এমন ক্ষেপে যাবার জোগাড় করল কেন?

কুয়াশার ভিতর হইতে সূর্য্যের মত কত ব্যর্থ দিনের বক্ষ ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে অনুপম আনন্দের ও কবিত্বের হিল্লোল ছুটিয়া যায়। একটি দৃষ্টি, একটু ইঙ্গিত, ছোট একটি অর্থহীন কথা হঠাৎ যেন তাহাদের আনন্দে ডুবাইয়া দেয়। তারার ক্ষীণ আলোয় সান্ধ্য বিদায় লইয়া দুজনে আর এক নতুন চোখে যেন দু'জনকে দেখিতে থাকে, আলো-আঁধারের মধ্যে দুজনকে খুঁজিতে থাকে। তাহাদের হাতের স্পর্শের এতটুকু শিহরণ, গলার একটু কাঁপুনি, এমনই কত সামান্য জিনিষ তাহাদের সমস্ত রাত্রির স্বপ্নকে ভরিয়া দেয়। শৈশবের সেই গভীর ঘুম কোথায় গেল? প্রতি প্রহরে ঘণ্টার শব্দে তাহারা জাগিয়া উঠে এবং তাহাদের হৃদয় যেন গান গাহিয়া উঠিয়া বলে, আমি ভালবেসেছি—আমায় একজন ভালবাসে।

প্রতিদিন তাহারা নূতন নূতন রহস্য আবিষ্কার করিতে লাগিল। প্রাচুর্য্য ও মাধুর্য্যের ডালি লইয়া হাস্য মুখর বসন্ত দেখা দিল। আকাশে বাতাসে কি এক অনুপম দীপ্তি ও স্নিগ্ধতা, কই আগে তো এ সব কিছুই চোখে পড়ে নাই! সমস্ত শহর তার লাল টালির ছাত, পুরানো দেয়াল, কঠিন বন্ধুর পথ, সবই কেমন যেন একটা মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া ক্রিস্‌তফের হৃদয় হরণ করিল। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইতেছে, মিন্‌না বিছানা হইতে উঠিয়া জানালায় কি এক ঔৎসুক্য ও আবেগে আকুল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বিকালে যখন ক্রিস্‌তফ্‌ কাছে থাকে না, মিন্‌না তখন একটা দোল্‌নায় বসিয়া দোলে এবং চোখ চাহিয়া স্বপ্ন দেখে। শরীর মন বসন্ত বাতাসের ছোঁয়ায় কেমন একটু মধুর জড়িমায় আচ্ছন্ন হইয়া আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে পিয়ানোতে নানান্‌ গৎ বাজাইতে থাকে; শ্রান্তিতে আবেশে তার মুখে পাণ্ডুর আভা ফুটিয়া উঠে। শুমানের সঙ্গীত শুনিবামাত্র সে কাঁদিয়া ফেলে। সর্ব্বজীবে করুণা ও দয়া যেন তাহাকে আকুল করিয়া তোলে। ক্রিস্‌তফেরও সেই অবস্থা, পথে ভিখারী দেখিলে লুকাইয়া তাহাকে পয়সা দেয়, দুজনেই দুজনের দিকে তাকায়, সমবেদনার সুখে দুজনে বিভোর।

আসলে কিন্তু করুণায় বান মাঝে মাঝেই ডাকে। মিন্‌না হঠাৎ তার মা'র আশৈশবের পরিচারিকা বৃদ্ধা ফ্রিডার গলা জড়াইয়া আদর করিয়া তাহাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয় অথচ কয়েক ঘণ্টা পরেই ফ্রিডা হুকুম তামিল করিতে একটু দেরী করিলে তাহাকে কড়া রকম ধমক না দিয়াও থাকিতে পারে না। ক্রিস্‌তফের অবস্থাও কতকটা সেই রকম। বিশ্বমানবের প্রেমে সে পাগল, একটি পোকামাকড়কেও পায়ে দলিতে সে শিহরিয়া উঠে, অথচ নিজের বাড়ীর লোকেদের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন। অপরের প্রতি করুণা তার যতই বাড়িতেছে, আপনার জনের প্রতি ঔদাসীন্য ঠিক তেমনই বাড়িয়া যাইতেছিল। আসলে দেখা যায় যে, তাদের দুজনের প্রতি ভালবাসার আতিশয্য মধ্যে মধ্যে যেন দয়ার স্রোতে অপরের উপর উপ্‌চাইয়া পড়িত। এই টুকু পরিবর্ত্তন ছাড়া আর সকল বিষয়েই তাহারা বেশ রীতিমত স্বার্থপর ছিল। কারণ নিজেদের চিন্তাই তাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা।

সেই একটি তরুণীর মুখ ক্রিস্‌তফের জীবনকে আজ কতখানি আচ্ছন্ন করিয়াছে। থিয়েটারের বক্সে মিন্‌না আসিয়া বসিবামাত্র ক্রিস্‌তফের সমস্ত রক্তের মধ্যে যেন নাচন ধরে। কি একটা অজানা শক্তির ঢেউ যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। কামনার রাজ্যে দুজনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, হয় তো দুজনে স্পষ্ট করিয়া জানে না। মিন্‌না নানান্‌ রকমে খেলার অছিলা করিয়া তাহাদের মুখ, তাহাদের ঠোঁট কাছে আসিয়া মিলিবার সুযোগ

করিয়া দেয়। প্রতি চুম্বনে তাহারা কেমন স্তম্ভিত হইয়া যায়। জোর করিয়া হাসিতে চেষ্টা করে, কিন্তু দুজনের হাত পা ঠাণ্ডা। এই সব ছোট খাট খেলা একদিকে যেমন মাথা ঘুরাইয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনই অদম্য আকর্ষণে টানে। তাহারা খেলিতে চায় অথচ পলাইতেও চায়। ক্রিস্তফের কেমন একটা ভয় করে। মিমনার মা অথবা আর কেহ থাকিলে সে কেমন যেন স্বস্তি বোধ করে। বাহিরের কেহ আসিয়া প্রেমের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিলে সে প্রেম যেন বেশী মধুর লাগে। ঠোঁটের একটু কাঁপন একটি কথা, একটি দৃষ্টি যেন সমস্ত জীবনটাকে নূতন ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত করিয়া দেয়। সেটা শুধু দুজনেই বোঝে, এইখানেই তার রহস্য এবং সেই রহস্যেই তাহাদের সুখ। বাহিরে অতি সাদাসাটা রকমের কথা চলিতেছে, অথচ প্রাণের ভিতরে বাজিতেছে লুকানো প্রেমের অন্তহীন সঙ্গীত। পরস্পরের মুখের অতি তুচ্ছ বাঁকাচোরা ভঙ্গী হইতে তাহারা যেন কত জিনিষ পড়িয়া লইতেছে। এই পড়ায় চোখ খুলি-বারও প্রয়োজন নাই, শুধু কান দিলেই যথেষ্ট। কানের ভিতর দিয়া প্রিয়তমের বাণী মরমে পশিতে থাকে। কেমন একটা নূতন বিশ্বাস তাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়াছে, তাদের আশার যেন সীমা নাই। শুধু ভালবাসা পাওয়া, শুধু সুখ। সন্দেহের ছায়ামাত্র নাই, ভবিষ্যতের আশঙ্কা নাই। জীবনের এই আদিম বসন্তের কি অদ্ভুত প্রশান্তি। আকাশে যেন এতটুকু মেঘ নাই। এ বিশ্বাস যেন কিছুতেই আচ্ছন্ন হয় না। এ আনন্দ যেন কিছুতেই ফুরাইতে পারে না। তাহারা কি সত্যই জীবিত, না তাহারা স্বপ্ন দেখিতেছে—এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন। বাস্তব জীবনে আর এই স্বপ্নের মধ্যে মিল কোথায়? কোথাও নাই—শুধু আছে এই কয়েকটি মুহূর্ত্তের যাদুমন্ত্র। তাহারা কে? স্বপন-সমুদ্রের দুটি তরঙ্গ মাত্র। তাহাদের পৃথক সত্ত্বা প্রেমের স্পর্শে যেন গলিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

—ক্রমশ

ডোরা

ম্যাক্সিম্ গোর্কি

(অনুবাদ)

স্যানাটোরিয়াম্-এ আটজন রুগী,—সবাই যক্ষায় ভুগ্‌ছে। সব রুগীদের মধ্যে যক্ষা রোগীই বেশি খাম্‌খেয়ালি। জ্বর একটুখানি বেড়ে গেলেই ভয়ে রাগে বা হতাশায় ওরা অবুঝ্ ঘ্যান্‌ঘ্যানে হয়ে ওঠে।

যক্ষার পোকাগুলির কিন্তু এক অদ্ভুত শক্তি আছে,—রুগীকে মারে, অথচ বাঁচবার প্রবল তৃষ্ণা তার মনের মধ্যে নিরন্তর জাগিয়ে রাখে। যে রুগী মৃত্যুর দুয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তারও অগাধ বিশ্বাস যে সে বেঁচে উঠ্‌বে;—আর প্রেমের জন্য আতুর হওয়া ত' যক্ষা রোগের প্রধান লক্ষণ। নৃতত্ত্ববিদ্ ট্রুম্‌পেল-ই, মনে হচ্ছে, এই অবস্থার নাম দিয়েছিল "যক্ষারোগীর আশা।"

ক্রিমিয়ার এক রুগী-আবাসে আটজন যক্ষারুগী;—ডোরা নামে এক অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়ে তাদের সেবা ও তত্ত্বাবধান কর্‌ত। মাঝে মাঝে ও বল্‌ত যে ওর বাড়ী

এস্থোনিয়ায়, আবার কখনো বলত ওর দেশের নাম ক্যারেলিয়া। ও ছিল বেজায় মোটা ও চ্যাপ্সা, কিন্তু লঘুচরণ,—ওর গতি যেমন দ্রুত তেম্নি নিপুণ। ওর সাদা মুখে ঘোড়ার ভালমানুষির ভাব মাখানো; ওর আঁটা লাল ঠোঁটের ফাঁকে করুণ একটু হাসি,—চর্ব্বির মতো তেল্তেলে, ওর বেগুনি-রঙের বড় বড় চোখ দুটিতে সেই হাসির তেল যেন ভাস্ছে।

ও যখন কিছু ভাবত, ওর মিওনো চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে উঠ্ত ও চোখের দৃষ্টি সীসের মতো ঘোর হয়ে যেত। যেমন অশিক্ষিত তেমনি বোকা,—বেশি চালাকি করতে গেলেই বোকামি বেরিয়ে পড়ত। তাই রুগীরা ওকে ঠাট্টা করে' 'বোকা' বলে' ডাকত। ও কিন্তু তাতে রাগ করত না,—খালি হাস্ত। রুগীদের প্রতি মা'র মতোই ওর সহিষ্ণুতা। যখন যক্ষ্মা রুগীরা তাদের চটচটে বিবর্ণ হাত দিয়ে ওকে আঁচড়াত, সুড়সুড়ি দিত, ও মরণ-পথযাত্রীদের সেই ভিজা দুঃখী হাতগুলি নিজের বড় বড় লাল থাবা দিয়ে আস্তে সরিয়ে দিয়ে বলত—"না। এ কি করছ?"

অনেকেই কাতর কণ্ঠে ওকে প্রেম জানাল,—দোকানি, দালাল,—একটা জোয়ান জেলেও, বউ তার মারা গেছে বটে। সবাই ওর সৌন্দর্য্যের কর্কশতায় মুগ্ধ হয়েছে—ওর দৈহিক বল, অবিশ্রান্ত উদ্যম, ওর স্বচ্ছন্দ সহজ স্বভাব। সবাই এই শান্ত, বিনম্র মেয়েটিকে জীবনের সহচরী করে' নেবার জন্য উন্মুখ। কিন্তু ওর ভাবখানা এম্নি উদাসীন,—যেন ধনী মহাজন ঠিকই জানে কখন ও কি করে তার মূলধন গচ্ছিত রাখ্তে হবে। এই সব রুগীদের অবিরাম কাকুতি যেমন শুন্ত, তেম্নি বোকার মতো, কিন্তু একান্ত নম্রতায় বিয়ের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করত,—একটি আব্দারও হাত পেতে নিত না।

যখন উত্তুরে হাওয়া দেয়, তখনো ওর গরম ঘোচে না। পাহাড়ের ওপর ছোট বাড়িটিকে ঘিরে ঘন কুয়াসা গুমোট ক'রে যখন ঘুপ্টি মেরে থাকে, গরম কোট ও মোটা কম্বলে গা মুড়ে রুগীরা যখন অসন্তোষে বক্ বক্ করে,—ওর তখনো গরম! রাত্রে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে ডোরা ওর মাথাটা এক কালো রুমাল দিয়ে ঢাকে,—রুমালের এক কোণে একটি লাল গোলাপ তোলা,—ছাতে এসে দাঁড়ায়, আর আমারই জান্লার নীচে নতজানু হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রার্থনা করে—

"ওগো ভগবানের মা..যীশু আমাদের প্রভু! হে সেণ্ট নিকোলাস, ঈশ্বরের গরীব ভৃত্য!.."

ডোরার মধ্যে কবিতার একটি রেশও আমি পাই নি। ফুলকে ও ভালবাসত না, বলত,—ওরা খালি ঘরের জঞ্জাল ও ধূলো বাড়ায়। এক রাত্তে এক পুরোতের স্ত্রী যখন পাকস্থলীর যক্ষ্মাতে মারা যাবার সময় আকাশ ও তারার ঐশ্বর্য্য দেখে বিভোর, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, ডোরা নিষ্ঠুরের মতো ওর সমস্ত উৎসাহ ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিল—"আকাশটা ঠিক ডিম-ভাজার মতো!"

একদিন ন'য়ের নম্বরের রুগীটি হাজির হ'ল। অনেক কষ্ট ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে রেলিঙটা ধরে' ডোরাকে বল্লে—"দেখ কেমন সুন্দর আমি! না?"

ঐ কথার সুরে ফুর্ত্তি ও বেদনা মিশে রয়েছে। হেসে ও ঐ বিপুলবপু মেয়েটির পানে চেয়ে রইল,—ওর স্ফীত বুকের দিকে।

"বাঃ! কি চমৎকার মজবুত জোয়ান তুমি!" বাতাস গিলে গিলে ও তাড়াতাড়ি কথা কয়,—"তুমি আমাকে ফের্ ভালো করে' দেবে? দেবে না?"

"নিশ্চয়ই। দেব বৈ কি।" ডোরা বল্লে।

লোকটার মুখ প্যাঁচার মতো, বিড়ালের মত গোল গোল চোখ, নাকটা ডগার কাছে বেঁকে এসেছে, কালো একটুখানি গোঁফ,—নিষ্ঠুর মুখ, যেন ঠাট্টা করছে।

সেই দিন থেকে ডোরা একেবারে বদ্লে গেল। কে যেন ওকে যাদু করেছে। আমাদের অসুবিধের আর শেষ রইল না। আমাদের কথা আর তত শোনে না, তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরের মধ্যে দিয়ে ছুটে যায়, গাফিলি করে' ঘর সাফ করে, আমাদের বকুনি ও নালিশের উত্তরে

রাগে খালি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে—কিন্তু ওর কাদাটে দুই চোখে যেন অপরূপ নেশা,—আলোর নেশা!

ও সহসা যেন কালা আর কানা হয়ে গেছে। কেবলই গভীর ঔৎসুক্যে ছাতের দিকে মুখ করে' দাঁড়ায়,—যেখানে সেই বেচারা ছাত্রটি—নাম ফিলিপফ্—প্যাঁচার মত মুখ,—অনবরত কাশে ও হাঁপায়। একটু ফাঁক পেলেই ডোরা ওর কাছে ছুটে যায়, সূর্য্য ডুবলেই ওর ঘরে গিয়ে সেঁধোয়,—আর বেরিয়ে আসে না।

ও? ও ত' মরতে বসেছে। অদ্ভুত রকমের মরা—হেসে আর ঠাট্টা করে'। সব সময়েই একটা হালকা সুর শিস্ দিচ্ছে, আর বারে বারেই কাশ উঠছে তাতে—মাটি হয়ে যাচ্ছে সুরটা। ওর চারধারে যেন একটা কৃত্রিমতা আছে,—বেপরোয়া বিবাগীর ভাব—আর যাই হোক্, বেশ কায়দা ক'রেই মুখোসটা পরেছে কিন্তু।

"তুমি এই সব মাথা-পাগ্লামি দেখে কি ভাবছ?" ওর বেড়ালের চোখ মটকে ও আমাকে শুধোয়—"কেমন লাগে তোমার? দিন, রাত্রি, জন্ম, ভালোবাসা, জ্ঞান, মৃত্যু—কি বল? খুব মজার না? আমার মতো ছাব্বিশ বছরের লোকের কাছে কিন্তু ভারি মজার এ সব!...ডোরা!"

জিনিস পত্রের ওলোট্ পালোট, চামচের নাড়াচাড়া শুনি—ডোরা এসে দাঁড়ায়,—নীরবে দুটি চোখ আগ্রহে বিস্ফারিত হয়ে থাকে। এই লোকটির হুকুম তামিল করতে।

"ওগো আমার ছোট্ট হাতীটি, চট্ ক'রে কিছু আঙুর এনে দাও।" আমাকে শুনিয়ে পরে বলে—"নেহাৎই হাঁদা মেয়েমানুষ।"

ও সমস্ত রুগীকেই ঘৃণা করে' আর তাদের ছোটখাট সমস্ত মৃত্যুলোষকে নির্দ্দয়ের মতো ঠাট্টা করে। ওকেও কেউ ভালবাসে না। আমরা দুজনে কিন্তু বন্ধু হয়ে গেছি,—আমরা দুজনেই সাহিত্য ভালবাসি কি না।

"মানুষের সব কিছু আবিষ্কারের মধ্যে সাহিত্যই সেরা।" বিবর্ণ হাত দিয়ে ঠোঁট দুটো ঘসে' ও বলে—"আর যতই জীবন থেকে দূরে সরানো, ততই সুন্দর।"

আমার মনে হয়, ও ঠিক যক্ষ্মাতেই মরছে না,—ওর বুকের ঠিক মাঝখানটাতে কে যেন ঘুষি চালিয়েছে।

এই রুগী-আবাসে আস্‌বার আটষট্টি দিন বাদে ও মারা গেল,—মৃত্যু যখন কামড় বসিয়েছে, তখন ও খালি প্রলাপ বক্‌ছিল—"ফিমা,...সমস্ত জীবন...আমি ভাল-বেসেছি তোমাকে . একা . চিরকাল ফিমা,...প্রিয়া..."

বিছানার পায়ের তলায় ব'সে ছিলাম আমি, আর ডোরা দাঁড়িয়ে ছিল ফিলিপফের পাশে, আর ওর প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে ওর নোংরা চুলগুলি টান্‌ছিল। ওর বাহুর তলায় একটা ছোট পুঁটুলি।

"কি বল্‌ছে ও?" ভেবড়ে গিয়ে ডোরা আমাকে জিগ্‌গেস কর্‌লে—"কে এই ফিমা?"

"একটি মেয়ে নিশ্চয়ই,—যাকে ও এতদিন ভালো বেসেছে, এখনো বাসে।"

"ভালোবাসে?—এই ফিমাকে?" ডোরা মূঢ়ের মতো চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"না, না, ও যে আমাকেই ভালোবাসে। যে দিন ও এখানে এল, সেই দিন থেকেই—"

কিন্তু ফের ফিলিপফের প্রলাপ শুনে ডোরা ওর মলিন জলতা দুটি তুলে' ওর ভিজা মুখটা জামাটা দিয়ে মুছে ফেলে সেই পুঁটলিটা আমার হাটুর ওপর ছুঁড়ে দিলে। বল্ল—"এই ওর সব আস্তরণ, মোজা, একটা সার্ট, আর কতক গুলি ঢিলা পায়জামা।" তারপর ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে চ'লে গেল।

প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে ফিলিপফের প্রলাপ থাম্‌ল। ও ক্ষণিকক্ষণ শাদা দেওয়ালের মাঝে জান্‌লার কালো গরাদটার দিকে আকুল চোখে চেয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে। কিছু বলতে চাইল হয়ত, গলা বুজে এসেছে। ঘুনে-খাওয়া ওর ছোট কুঁকড়ানো দেহটা মোচড় দিয়ে একেবারে টান্, লম্বা হয়ে গেল;—অগাধ শান্তি!

ডোরাকে ডাকতে গেলাম। ও ছাতে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে,—আর যে দূরস্তিসীমা[illegible]কালো আকাশ আর পৃথিবী বুক ঘেঁষাঘেঁসি করে রয়েছে,—কে কোন্ জন চেনা যাচ্ছে না,—সেই দিকেই ওর উদাস চোখ দুটি।

ও ওর ঢ্যাপ্‌সা মুখটা আমার দিকে ফেরাল—সে মুখ কী কর্কশ ও নিষ্ঠুর! অদ্ভুৎ কিন্তু।

"ওর হয়ে গেছে। যাও, ওকে বা'র কর, ডোরা।"

"কক্‌খনো না।"

ডোরা ওর পা দিয়ে মাটি আঁচ্‌ড়াতে লাগ্‌ল।

"কক্‌খনো না।" ফের্‌ ও বল্লে—"ও রকম লোকের কোন কাজে আমি আসব না। ভাব, কি রকম লোক? আমাকে বল্লে যে আমাকে নাকি ও ভালোবাসে, কিন্তু বরাবর ..."

"হাঁ, কিন্তু ও যে মরতে বসেছিল, তা বুঝি দেখনি?"

"তাতে কি? হাঁ, তা ত' দেখেছিলাম; আমি ত আর কানা নই। আমার শেষ পয়সা ক'টি দিয়ে পর্য্যন্ত ওর জন্য মৃত্যু-উপহার কিনে দিয়েছি। যে দিন ও আসে সেই দিনই মনে মনে বলেছিলাম—আহা, বেচারা!... মর্‌তে বসেছিল বটে! মরে ত' সবাই। তার জন্যে মিথ্যা কথা কেন,—ঠকানো কেন? 'আমি আর কাউকে ভালবাসিনি'—আমাকে ও বল্লে?—কেমন?—এই ত' তোমার প্রিয়া কে, বেরিয়ে গেল।...যতবার খুসি মর, কিন্তু মিথ্যা কথা কয়ো না।"

চাপা গলায় কথা কইছিল ও, আর যেন কি ভাব্‌ছিল।

হঠাৎ ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল!—যেন বুক ভাঙা দুঃখ! যেন এক বাটি ফুটন্ত গরম জল গিলে ওর সমস্ত বুকটা ও পুড়িয়ে ফেলেছে।

"এস ডোরা।"

"তোমার যদি এতই দয়া হয়ে থাকে, তুমিই গিয়ে ওকে সাজিয়ে দাও। আমি কক্‌খনো যাব না। আমার কে ও?...খেল্‌না একটা।"

"মরা মানুষকে কি করে' সাজাতে হয় আমি যে জানি না।"

"আমার কি তাতে? আমি ওকে চিনি না।"

"কিন্তু শত্রু হ'লেও ও যে ম'রে গেছে।"

"কি হয়েছে তাতে? আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না। ওরকম লোককে আমি চোখ দিয়ে আর দেখতে চাই না।—ঠক, মিথ্যুক।"

শেষ পর্য্যন্ত ডোরা গেলই না, গোঁ ধ'রে একলা চুপ করে' ছাতে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি যখন ফিলিপককে সাজাচ্ছিলাম, চাপা অথচ বুকভাঙা ককানি শুনে ছাতে দৌড়ে চ'লে এলাম।

মানুষকে এক এক সময় জ্বলন্ত অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌তে হয়,—তাতে না থাকে শীতলতা, না থাকে শান্তি;—ডোরার চোখেও সেই আগুনের মতো অশ্রু। মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে' ও ওর মাথাটা রেলিঙে কুট্‌ছে, আছড়াচ্ছে,—ফুঁপিয়ে উঠছে, ককাচ্ছে,—আর অনবরত চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে—

"আমার উৎকট প্রিয়তম,—আমার ক্ষুদ্র রাক্ষস,—আমার ছাগল ছানাটা..."

(গর্কির ডায়ারি হইতে)

যাদুঘর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৫)

বাংলা দেশেরই কোনও একটি অখ্যাত পল্লীর একখানি পর্ণকুটীরে বসে বিভা নিবিষ্ট মনে কাকে পত্র লিখছিল, এমন সময় তার স্বামী নির্ম্মল একখানা টেলিগ্রাম হাতে ক'রে সেই ঘরে এসে ঢুকল।

বিভা চট্ ক'রে কলমটা ফেলে দিয়ে মাথার কাপড়টা নাকের ডগা পর্য্যন্ত টেনে দিলে।

নির্ম্মল বিভার সেই চকিত সলজ্জ ভাব দেখে হেসে ফেলে বল্লে—আচ্ছা আমার কাছেও তুমি এত লজ্জা কর কেন বলতো? আমি তো তোমার শ্বশুরও নই ভাসুরও নই বিভা!

বিভা এ কথার উত্তরে শুধু নীরবে নতমুখে বসে, রইল দেখে নির্ম্মল ব'ললে—দেখ লজ্জা যদিও নারীর ভূষণ কিন্তু সেটা বেশী মাত্রায় অভ্যাস হ'য়ে পড়লে ঐ ভূষণটাই আবার মেয়েদের বন্ধন হ'য়ে ওঠেনা কি? অন্ততঃ আমার সামনে তুমি অতবড় ক'রে ঘোমটাটা টেনে দিও না বিভা, ওতে আমার একটু অসুবিধা হয়। তোমার ঘুমন্ত মুখখানি ছাড়া জাগ্রত মুখখানি ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার সুযোগ আমি এ ক'দিনের মধ্যে একটিবারও পাইনি! আজ মামাবাবু আর মামীমা বাড়ীতে নেই বলেই সাহস ক'রে দিনের বেলায় তোমাকে একটু ভাল ক'রে দেখতে এলুম! নইলে জানতো আমাদের দেশে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গেও দিনের বেলা সাক্ষাৎ করাটা প্রায় ব্যাভিচারের মতই একটা অপরাধ।

বিভা এবারও নিরুত্তর রইল। শুধু মাথার কাপড়টা তার নাসিকাগ্রভাগ থেকে সরিয়ে নব-সিন্দুর-রঞ্জিত সুচারু সীমন্তের উপর তুলে দিলে। কিন্তু মুখখানি সে তখনও নীচু ক'রেই রইল।

"বাঃ, তুমি তো বেশ লক্ষ্মীমেয়ে!" শুধু এই একটি কথা বলেই রূপমুগ্ধ নির্ম্মল অনেকক্ষণ সেই অনবগুণ্ঠিত আনত মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—একবার, মুখ তুলে আমার দিকে দেখ না। আমাদের এখনও শুভদৃষ্টি হয়নি মনে আছে? বিয়ের দিন ছাঁদনা তলায় তুমি কিছুতেই আমার দিকে [illegible] দেখনি। সবার অনুরোধ ঠেলে আমাদের শুভদৃষ্টির লগ্নটিকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিলে। সে কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। তোমার লজ্জাকে তো আমি সেই জন্যই এত ভয় করি! সে রাত্রে দারুণ লজ্জায় তুমি কিছুতেই আমার মুখের পানে তাকাতে পারলে না, তোমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করবার জন্য আমার ব্যাকুল দৃষ্টি বার বার তোমার মুখের পানে চেয়ে অপমানিত হ'য়ে হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছিল। বিভা এবার হঠাৎ মুখ তুলে দুই ডাগর চোখের পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে নির্ম্মলের দিকে

চাইতেই নির্ম্মলের মনে হ'ল যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সহসা বিদ্যুৎ চমকে উঠল! বিজন-প্রান্তর পথে নিঃসঙ্গ-পথিকের মতো'ই সে প্রথমটা চমকে উঠেছিল কিন্তু ধাঁধাটা কেটে যেতেই সে দেখলে যে—একি!—জল ভরেছে আজ গগনের নীল নয়নের কোণে!

বিভার সেই বড় বড় চোখ দুটি একেবারে জলভারে টলটল করছে দেখে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কেঁদে ফেললে কেন বিভা? আমি কি তোমাকে কিছু রূঢ়-কথা বলেছি?

আঁচলে চোখ দুটো মুছে ফেলে একটু ধরা গলায় বিভা বললে—না।

—তবে?

বিভা নিরুত্তর।

—তুমি এখানে এসে পর্য্যন্ত দেখছি কেমন যেন মনমরা হ'য়ে রয়েছো! কেন বলোতো? এই পাড়াগাঁয়ের এ খোড়ো মেটে বাড়ীতে এসে তোমার কিছু ভাল লাগছে না, না?

বিভা তবুও নিরুত্তর।

—আমার কথার একটা কিছু জবাব দাও বিভা, অন্তত বলো তোমার কি অসুবিধে হ'চ্ছে, নইলে আমার দ্বারা তার প্রতিকার করা সম্ভব হবে কেমন করে?...আচ্ছা, তোমার কি বাড়ীর জন্য বড় মন কেমন করছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে একটা কিছু বলবার সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে দেখে বিভা আবার মুখটি নীচু করে খুব আস্তে বললে—হুঁ!

—কার জন্যে মন কেমন করছে বিভা? বাবার জন্যে? ছোট খুকীর জন্য?—

—বাবার জন্যে, নিভার জন্যে, প্রকাশদার জন্যে—সবার জন্যেই বড় মন কেমন করছে—

—আচ্ছা, তাহ'লে আজই আমি শ্বশুর মশাইকে লিখে দিচ্ছি, নিভাকে নিয়ে পত্রপাঠ তিনি এখানে চলে আসুন, কারণ তিনচার দিনের মধ্যেই আমার জয়পুরে চলে যেতে হবে। মনে করছি তোমাকে মামার বাড়ীতে কি বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখে না গিয়ে সঙ্গে করেই নিয়ে যাবো। কথায় বলে 'স্ত্রীভাগ্যে ধন'—আমার অদৃষ্টে দেখছি এটা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল! তুমি আমার ঘরে পা দিতে না-দিতেই আমার জয়পুরের সেই কলেজের প্রোফেসারিটা লেগে গেছে! এই দেখ কলেজের প্রিন্সপ্যাল আজ wire করেছেন "Join at once!" অর্থাৎ 'এখনি এসে কাজে যোগ দাও'—ওহো; তাওতো বটে, তোমাকে আবার ইংরিজির মানে ক'রে বোঝাবার দরকার কি? তুমি তো বেশ ভাল রকমই ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছো, আবার গান বাজনাও জানো শুনেছি! এখানে তো আর তা শোনবার উপায় নেই। থাক্, জয়পুরে গিয়ে আমি তোমার গান শুনবো, কেমন?

—জয়পুর!

—হ্যাঁ, একটু দূর বটে; কিন্তু বেশ ভাল জায়গা।

—জানি, রাজপুতানার একটা নেটিভ্ ষ্টেট।

—হ্যাঁ, যাবে আমার সঙ্গে?

—যদি 'না' বলি তাহ'লে কি আপনি শুনবেন?

—নিশ্চয়, আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে নিয়ে যেতে চাইনে।

—শুনে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হ'ল। আমিও আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কাজ ক'রবোনা জানবেন। জয়পুর বহুদূর হ'লেও আপনার সঙ্গে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। দেখি, যদি বিদেশে গিয়ে সবাইকে ভুলতে পারি!

—কেন, বিভা, সবাইকে ভুলতেই বা হবে কেন? ছুটির সময় আমরা কলকাতায় আসবো; সবার সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ হবে। মাঝে মাঝে আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেও সেখানে নিয়ে যাবো! তুমি তো আর নির্ব্বাসনে যাচ্ছোনা! ..

বিভা মনে মনে যদিও ব'ললে—এ আমার নির্ব্বাসনই বটে। কিন্তু মুখ দিয়ে তার কোন কথাই ফুটলনা! সে আবার হেঁট হয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তার অর্দ্ধসমাপ্ত চিঠির কাগজের পাশ থেকে কলমটা তুলে নিতেই নির্ম্মলের সে দিকে দৃষ্টি পড়ল, সে তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ললে—

তাইত,—তুমি চিঠি লিখছিলে,—তোমাকে তবে আর বিরক্ত করবোনা, আমি যাই।

—চিঠি লেখা কিন্তু আমার শেষ হ'য়ে গেছে, শুধু নাম সই টুকু বাকী; আর যদিইবা না লেখা হ'তো—তাহ'লেও আপনি এসে পড়াতে আমি বিরক্ত হ'তে যাবো কেন?

—বাঃ, তোমার স্বভাবটি ভারি মিষ্টি ত! এই বলে নির্ম্মল হেঁট হয়ে বিভা যে চিঠিখানা লিখছিল সেখানার দিকে একবার চেয়েই বলে উঠল—

—তাইত! ইস্! এতো আমি আগে কখনও দেখিনি! কি সুন্দর তোমার হাতের লেখা! যেন সারি সারি কুন্দকলি ফুটে উঠেছে। চিঠিখানা নিতে আমার এমন লোভ হ'চ্ছে!..এ চিঠি কে পাবে?

বিভা ততক্ষণে চিঠির নীচেয় তার নাম সই শেষ করে নির্ম্মলের প্রশ্নের উত্তরে কিছু না ব'লে শুধু নীরবে তার হাতে সেই চিঠিখানাই তুলে দিলে।

নির্ম্মল খুশী হ'য়ে চিঠিখানা আদ্যোপান্ত প'ড়ে অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলে—সে কি?—তোমাদের সেই প্রকাশদা?—সেই বিয়ের রাত্রে যে সুন্দর সুপুরুষ ছেলেটি খুব খাট্‌ছিল?—সে নিরুদ্দেশ! আজও পর্য্যন্ত তার কোনও সন্ধানই পাওয়া যায়নি?

—বাবা তো তাই লিখেছেন।

—তাইত! আহা! সে ছেলেটিকে কিন্তু আমার বড্ড ভাল লেগেছিল! আচ্ছা, কেন ব'লতো সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। তাকে তো বেশ আমুদে ছেলে বলেই আমার বোধ হ'য়েছিল!...

কেন যে প্রকাশ এমন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে—সে খবরটা বিভার কাছে আজ অবিদিত না থাকলেও, নির্ম্মলকে আর সে কথাটা সে বলে উঠ্‌তে পারলেনা।

নির্ম্মল বল'লে—তাই বুঝি এই হু'তিন দিন তুমি একেবারে এতটা মুস্‌ড়ে প'ড়েছো! তা কষ্ট হবার কথা বটে! সে ছেলেটি তোমার কি রকম ভাই বিভা?—

বিভা কোনও উত্তর দিলে না।

সে চুপ ক'রে আছে দেখে নির্ম্মল বললে—তোমার মামাতো ভাই না?

—না

—পিস্তুতো ভাই?

—না

—তবে?—তোমার মাসীমার ছেলে বুঝি?

—না, আমার মাসীও নেই, পিসীও নেই, শুনিছি এক মামা ছিলেন, তিনি নাকি অবিবাহিত অবস্থায়ই যান্না গেছেন। প্রকাশদার সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্বন্ধ কিছু নেই বটে, কিন্তু—

বিভা হঠাৎ চুপ করলে—মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকবার পর একেবারে অস্থির হ'য়ে বলে উঠ্‌ল—কিন্তু তুমি কি বুঝ্‌তে পারবে?—বাবার পরই তাঁর চেয়ে আপনার লোক আর আমাদের কেউ নেই! শিশুকাল থেকে—প্রকাশদা ছাড়া আর কোনও নিকটতম আত্মীয়কেই আমরা জানিনি! বলতে বলতে বিভা একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো!—

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পাশটিতে ব'সে নিজের কোঁচার কাপড়ে সস্নেহে বিভার চোখ হু'টি মুছিয়ে দিয়ে বললে—

বুঝিছি বিভা, এই এক মামা আর মামী ছাড়া আমারও আর কোনও আত্মীয় নেই! তোমার সম্পর্কে যদি আজ প্রকাশদা'কে পেয়েছি,—তাকে তো কিছুতেই হারাতে পারবোনা! সে যে আজ তোমার মতো আমারও সবার চেয়ে আপন জন হ'ল। সে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে থাকবে? তাকে আমি ঠিক খুঁজে বার করে নিয়ে আসবো!

—সত্যি?—

—নিশ্চয়!

—আঃ! তাহ'লে আপনি আমার যে কি উপকার করবেন সে আমি ব'লে বোঝাতে পারবোনা!—

—অনেক সময় কিছু বলার চেয়ে না বলাটাই যে বেশী কথা বুঝিয়ে দিতে পারে বিভা! তোমায় আর কিছু বলতে হবেনা, আমার হৃদয় দিয়ে আমি তোমার হৃদয় অনুভব করতে পারছি। আমার ইচ্ছে করছে এখনি যদি কোথাও থেকে তোমার প্রকাশদাকে ধরে এনে তোমার

সামনে হাজির ক'রে দিতে পারতুম তাহ'লে তোমার বুকের ব্যথা মুছিয়ে দিয়ে ধন্য হ'য়ে যেতুম? কিন্তু তার তো কোনও উপায় নেই!··· আচ্ছা, তুমি কি একটা কাজ করতে পারোনা?—প্রকাশদার জন্যে নিশ্চয়ই তোমার খুবই মন কেমন করছে—না? যতদিন না তাকে পাওয়া যায় তুমি কেন আমাকেই তোমার সেই প্রকাশদা বলে মনে ক'বো না। আমি আজ থেকে তোমার প্রকাশদা হলুম, কেমন?

বিভা চমকে উঠে নির্ম্মলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে—সে মুখে বিদ্রূপ বা বিরক্তির ছায়ামাত্র কোথাও নেই। প্রশান্ত সরল সহাস্য মুখ—দুটি চোখে—স্নেহ মমতা ও সহানুভূতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি! বিভার মনটা যেন সে মমত্ব অনুভব করে বেশ একটা তৃপ্তি বোধ করলে!

সে গলায় আঁচল দিয়ে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নির্ম্মলকে একটা প্রণাম করে তার পায়ের ধূলো না নিয়ে থাকতে পারলে না।

(৬)

—বামুন দিদি!

—কি নিভাদি?

—তুমি কিছু রাঁধতে জানোনা।

—সে কি? কত বড় বড় লোকের বাড়ী আমি রাঁধুনির কাজ করে এসেছি। সবাই আমার রান্নার সুখ্যাতি ক'রেছে, কারুর মুখে কখন নিন্দে শুনিনি, আর তুমি এক রত্তি মেয়ে আমাকে অত বড় শক্ত কথাটি বললে? রোসো, আজ কর্ত্তা বাড়ী এলে তাঁকে তোমার এই আস্পর্দ্ধার কথা শুনিয়ে আমার মাইনেপত্র বুঝে নিয়ে চলে যাবো—

—তা যেওনা, বড় ব'য়ে গেল! কাল বাদে পরশু তো আমার দিদি আসবে। দিদি তোমার চেয়ে ঢের ভাল রাঁধে। তোমার রান্না আমার একটুও ভাল লাগে না। বাবাও তোমার রান্না কিছুই খেতে পারেন না! দিদি শ্বশুরবাড়ী চলে যাবার পর যেদিন থেকে তুমি রেঁধে দিচ্ছ, বাবার পাতে সবই পড়ে থাকছে, তিনি কিছুই দাঁতে কাটছেন না। দিদি রাঁধলে তিনি সব চেটে পুটে খেতেন।

—তাই বুঝি তুমি অমনি গৃহিণীর মতো ঠিক করে ফেললে যে, আমি কিছু রাঁধতে পারিনি? বলে—কত পোলাও কালিয়া কোপ্তা কাবাব রেঁধে আমি নাম কিনে এলুম, আর তোমাদের এই ডাল-ভাত রাঁধতে এসে আমার হবে অপযশ? বড় মেয়ের জন্য মন কেমন করছে ব'লেই কর্ত্তার মুখে কিছু রুচ্ছেনা—নইলে রাঁধুক দেখি কে কত বড় রাঁধুনির মেয়ে—আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পল্তার সুক্তুনি, শাকের ঘণ্ট—কি মাছের ঝোল—

আচ্ছা, দেখো—আমার দিদি আসুক আগে।

এই বলে নিভা অনেকক্ষণ চুপটি করে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগল; তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা বামুন দি, শ্বশুরবাড়ী গেলে কি সত্যিই আটদিনের আগে আসতে নেই?

—না, তবে কাছাকাছি শ্বশুর-ঘর হলে আটদিনের ভিতরও আনাগোনা করে দেখেছি!

—আঃ, দিদিটার যদি কাছা-কাছি কোথাও বিয়ে হ'তো—

—সে তাঁর অদৃষ্ট! কাছা-কাছি যে কোথাও বর পাওয়া গেলনা! নইলে কর্ত্তা তো খুঁজতে কসুর করেন নি।

—আচ্ছা বামুন দিদি, তোমার বিয়ে হয়েছিল?

—শুনেছি হ'য়েছিল।

—তোমার অজান্তে হয়েছিল বুঝি?

প্রায় তাই। সে এত ছোট বেলায় হ'য়েছিল যে আমার কিছু মনে নেই।

—তোমাকেও কি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আটদিন থাকতে হয়েছিল?

—হয়ত হয়েছিল, আমার শ্বশুরবাড়ীর কথা কিছু মনে পড়েনা। বিয়ের খুব অল্প দিন পরেই আমি বিধবা হ'য়েছিলুম।

—আচ্ছা, তোমার বরও কি খুব ভাল রাঁধুনি ছিল? তুমি বুঝি তার কাছেই রান্না শিখেছিলে?

—দূর বোকা মেয়ে! সে কেন রাঁধুনি হ'তে যাবে? সে আমাদের গ্রামের জমীদারী সেরেস্তায় কাজ করতো শুনিছিলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে চেনা-পরিচয় হবার আগেই সে স্বর্গে পালিয়ে ছিল!

—তুমি তবে রাঁধুনি হলে কেন?

—সে অনেক কথা; আমাকে আজ রাঁধুনী হতে হ'য়েছে আমারই দুর্ব্বুদ্ধির দোষে! নইলে দেশে থাকতে পারলে আমার একটা পেট, হেসে খেলে চলতে পারত। আমার মাও তো আমাকে নিয়ে অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে কখন কারুর দোরে দাসত্ব করতে যেতে হয়নি। অল্প কিছু জায়গা জমি, একটি পুকুর আর একখানি কুঁড়ে ঘর এই সম্বল ক'রেই মা আমাকে রাণীর হালে মানুষ করেছিলেন, ভাল ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আমি পোড়ারমুখী সৎপথে ঠিক থাকতে পারলুম না বলে সব হারালুম! সুখের প্রলোভনে ভুলে দুষ্টু লোকের মিছে কথায় বিশ্বাস করে আমি আজ সব খুইয়েছি!

বলতে বলতে বামুন দিদির চোখ দুটি জলে ভরে উঠ্‌ল দেখে নিভা নিজের আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে বললে—আহা কেন তুমি দুষ্টু লোকের কথায় ঠকলে বামুনদি?

নিভাদের বামুনদিদির মুখে এবার একটু মৃদু হাস্যের ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠতে দেখা গেল! কিন্তু তখনই আবার সে কাতর হয়ে পড়ল—দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠে বললে—কেন যে ভুলেছিলুম—সে তুই ছেলেমানুষ দিদি, বুঝতে পারবি নে! শুধু এই টুকু জেনে রাখ্ যে, তাতে ভগবানের হাতও ছিল, মানুষে মানুষকেই ষোলআনা দোষী করে বটে; কিন্তু এর জন্য অনেকখানি দায়ী সেই সৃষ্টিকর্ত্তা—

বামুন দিদির কথা শেষ হবার আগেই নিভা তার বাবার বাড়ী ফিরে আসার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গেল।

পিতার হস্তে একখানি খোলা চিঠি রয়েছে দেখে নিভা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ও কার চিঠি বাবা? দিদির বুঝি?—পরশু তো ঠিক আটদিন হয়ে যাবে, সেদিন দিদি আসবে তো ঠিক, কি লিখেছে?—

মাষ্টার মশাই কন্যাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন—না মা, তোমার দিদি আর এখন আসবেন না। তোমার জামাইবাবু তাকে নিয়ে কালই জয়পুর চলে যাচ্ছেন। সেখানকার কলেজের প্রোফেসারী কাজটা তার হয়েছে। এই পয়লা তারিখ থেকেই কাজে লাগতে হবে। তাই সে এই চিঠি লিখে জানিয়েছে যে কালই সে তোমার দিদিকে নিয়ে জয়পুর যাচ্ছে। তোমার জামাইবাবুর ইচ্ছে ছিল যে, তোমার দিদিকে এখন এখানে রেখে তিনি একলাই জয়পুর যাবেন, কিন্তু তোমার দিদি নাকি তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য জিদ্ করাতে সে বিভাকেও নিয়ে যাচ্ছে।

নিভা এ খবর শুনে কেঁদে ফেললে! মাষ্টার মশাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—এই ত গ্রীষ্মের ছুটী এসে পড়ল ব'লে। সেই সময় তোমাতে আমাতে জয়পুরে যাবো তোমার দিদিকে দেখতে—কেমন?—একথা শুনে নিভা চোখের জল মুছে ফেলে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল!

— ক্রমশ

আকাশে আবার আষাঢের মেঘ দেখা দিয়াছে। পৃথিবীর এই বহু পুরাতন আষাঢ়—মেঘের পুঞ্জ লইয়া গর্জ্জনে, বর্ষণে, অন্ধকারে, নিত্য নূতন চিত্রবিন্যাসে মানুষের মনকে বাহিরে টানিয়া আনে।

মানুষের মনের দৃষ্টি যে ভাবে যত গভীরে চলিতে পারে, বাহিরের বস্তু ততই তাহার কাছে সহজ, সরল ও অপরূপ হইয়া দেখা দেয়।

কিন্তু সমালোচকের দল ছাড়িবার পাত্র নন্। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন, তাঁহাদের বিরূপ সমালোচনার দ্বারাই দেশের সমস্ত কিছু ত্রুটি সংশোধিত হইয়া যাইবে। এবং তাঁহারা যাহা বলিতেছেন তাহাই চরম সত্য।

কিছুকাল ধরিয়া বাঙলা গল্প উপন্যাস লইয়া খুব কথা-বার্ত্তা চলিতেছে। এবং বাঙলা সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া বাঙালী ছেলেদের অনেকে অন্যায় ভাবে নিন্দা করিতেছেন। বাঙলা সাহিত্যের সহিত তরুণ দলের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বুদ্ধিমান লোকেও বুঝিতে পারে না। কিছুকাল ধরিয়া তরুণদের অযথা গালি দিয়া মুরুব্বিয়ানা করা একটা ফ্যাশান হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য তরুণদের গালি দেওয়া খুব সহজ। কারণ তাহারা ঐ সকল কথার কোনও প্রতিবাদ করে না। তাহারা বেশ জানে, আজ যাঁহারা তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে দোষ ধরিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এককালে তরুণ ছিলেন।

তাহা হইলেও সব চাইতে মনে লাগে যখন দেখা যায় অকারণে না জানিয়া শুনিয়া কেহ বাঙালার তরুণ সমাজকে অভদ্রভাবে আক্রমণ করেন। তরুণ দল যদি এত নিকৃষ্ট চরিত্রও হইয়া থাকে তাহা হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে মাতা বা অভিভাবকের অধিকার গ্রহণ করিয়া ও এরূপ নিষ্করুণভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইঁহারা নিজেদের বক্তব্য বলিতে যাইয়া যেরূপ অভদ্র ভাষা ও অসংযম প্রকাশ করেন তাহাতে সে সকল মতামতের মূল্য নিতান্ত মূর্খ লোকেও দিতে পারে না।

বর্ত্তমানকালে তরুণদের যে অসীম ধৈর্য্য ও বিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা তাহাদের অভিভাবক-স্থান-গ্রহণেচ্ছু অনেক প্রবীণের মধ্যেও দেখা যায় না।

ইহারা বয়সে নবীন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে কাহারও অপেক্ষা বড় কম নহেন অথচ ইঁহারা কোনও মুরুব্বির ধার ধারেন না। কেহ কেহ মনে করেন ইঁহাদের গাল দিয়া যত

সহজে বাহবা পাওয়া যায় তত আর কিছুতে পাওয়া যায় না। নিজেদের কাজ গুছাইতে বা নিজেদের প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা করিতে আবার ইঁহারাই তরুণদের পিঠ চাপড়াইয়া সাময়িক প্রশংসা করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

এই নবীনের দল সকল কাজেই যেমন নীরবে নিঃস্বার্থ-ভাবে দেশের সকল কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া সকল গ্লানি ও দুঃখের ভার মাথায় পাতিয়া লয়, সাহিত্যের সেবা ও সাধনায়ও ইঁহারা সেইরূপ নীরব ও নির্লিপ্তভাবে সকল অপবাদ ও অন্যায় অভিযোগ সহ্য করেন।

আজ যাঁহারা সংসারের সকল পথ ঘুরিয়া স্বাভাবিক নিয়মে বয়োজ্যেষ্ঠতা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় নিজেদের নিতান্ত অসহায় মনে করিয়াই এক একবার দেশের তরুণ দলের প্রতি বিষ উদ্গীরণ করেন।

এই অল্পদিন পূর্ব্বেই বিহার সাহিত্য সম্মিলনের সভানেত্রীরূপে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী মজঃফরপুর শহরে বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে গিয়া আজকালকার ছেলেমেয়েদের পোষাক, হাবভাব, ভাষা ও লেখা সম্বন্ধে যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গী কোনও লোকের পক্ষেই শোভন নহে। অবশ্য সভানেত্রী মহাশয়া নিজে 'মাতা'-আখ্যা গ্রহণ করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছেন।

মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সভানেত্রী মহাশয়ার একখানি প্রতিচ্ছবিও প্রকাশিত হইয়াছে। খুব সম্ভব ছবিখানি এ কালের নহে, কারণ তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালার আজকালকার পোষাক পরিচ্ছদের উপরও এমন সব মন্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে যে, তাহা পড়িয়া আর এ ছবি তাঁহার বর্ত্তমান মনোভাবের উপযোগী বলিয়া ভাবা অন্যায় হয়।

সভানেত্রী মহাশয়া অনেক কথার ভিতর বলিয়াছেন, আজকালকার ছেলেমেয়েরা সংস্কৃত ভাষা পড়ে না বা জানে না। আজকালকার কোন্ ছেলেমেয়েদের দেখিয়া তাঁহার এ ধারণা হইল তাহা জানা যায় নাই। হয়ত তিনি এ কথা জানেন না যে, আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশী সংস্কৃত পড়ে ও জানে।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের জ্ঞানপিপাসা স্বাভাবিক, কাহারও সাহায্য বা অনুপ্রেরণার অপেক্ষা রাখে না; তাহারা কোনও জিনিষ শুধু লিখিবার মত করিয়া শেখে না, শিখিবার জন্য শেখে।

সভানেত্রী মহাশয়া একস্থানে বলিয়াছেন, "মায়ের প্রাণ ধিক্কারে ও হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে" 'এমন সব সন্তান গর্ভে বহন ও বক্ষশোণিতে বর্দ্ধন না করিয়া সূতিকায় একটু করিয়া নুন দিলেই ভাল হইত। প্রতিবেশীর ঘরগুলি নিরাপদ হইতে পারিত, সধবা-বিধবা নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদাই পুরুষের জলন্ত ক্ষুধিত দৃষ্টির শিকার হইয়া ফিরিতে হইত না।' সভানেত্রী মহাশয়ার কথা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ "বি, এ, এম এ, ক্লাসেরই হোক, আর এম, বি, এম, এস্ সি-ই হউক আর সদ্য বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা যা কিছুই হউক, তা তিনি যেই হউন বা যাই হউন, প্রতিবেশীর গৃহরন্ধ্রে, স্কুলের বাসে, ট্রেনে, ষ্টীমারে, পথে ঘাটে, প্রান্তরে পার্টিতে যেখানে যে ভাবে, যেমন অবস্থাতেই হউক না কেন একটা মেয়ের গায়ের গন্ধ পাইলেই হইল, অমনই নররক্ত-লোলুপ বাঘের মতই তাহার নাক, কান, চোখ সজাগ হইয়া উঠিল; আর রক্ষা নাই। ইত্যাদি'—তাহা হইলে সত্য সত্যই সমস্ত পুরুষ-সন্তানদের অতি শৈশবেই মুখে নুন দিয়া মারিয়া ফেলা উচিত। তবে অনেক পিতামাতাই হয়ত ইহাতে রাজী হইবেন না। কারণ এমন পিতামাতাও আছেন যাঁহারা জানেন সন্তান-জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে সন্তানের নিজের কোনও হাত থাকে না এবং সকল পিতামাতাই আশা করেন তাঁহার সন্তান হয়ত করমচাঁদ গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেবচন্দ্র বা সুভাষচন্দ্র প্রভৃতির মত হইতে পারে। তাই না জানিয়া কেহ শিশুকালেই শিশু-হত্যার পক্ষপাতী নন্।

অশ্লীল সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া এ সকল বিষয় এমন ভাবে উল্লেখ করা সভানেত্রীর পক্ষে বিজ্ঞতার পরিচায়ক হয় নাই। সাধারণত লোকে এরূপ আলোচনাকে 'অবান্তর কথা' বলিয়া থাকে।

"গড়পড়তায় শতকরা ৭৬ জন ছেলে বুঝি ঐ" এই সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া বাঙলাদেশের সকল ছেলেদের সম্বন্ধে

গোষ্ঠীগত ভাবে এরূপ অভদ্রোচিত মন্তব্য প্রকাশ করিবার কি কারণ ছিল তাহা আমাদের "জননী" স্থানীয়া যাঁহারা তাঁহারা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বিচার করুন। কারণ সভানেত্রী মহাশয়া সন্তানদের দোষের কথা বলিতে যাইয়া "ইহার মধ্যে অভিভাবকগণের শৈথিল্য ও অক্ষমতারই প্রাধান্য বেশী" বলিয়া জানাইয়াছেন।

সভানেত্রী মহাশয়া বলিয়াছেন, আজকালকার গল্প উপন্যাসে কেবল লঘু ভাবেরই প্রাধান্য বেশী'। কিন্তু সে লেখা পড়ে কে? বাঙলা দেশের স্ত্রী পুরুষই ত? তাহা হইলে কি সভানেত্রীর মহাশয়া বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙলা দেশের অধিকাংশ স্ত্রী ও পুরুষই লঘুচিত্ত? কিন্তু আমরা এ কথা মানিতে প্রস্তুত নই। এবং আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, সভানেত্রীর মহাশয়ার মত সমালোচকেরা যাহা কুরুচি ও লঘুচিত্ততার পরিচায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহা কুরুচির পোষকতাও নহে, লঘুভাব প্রকাশের চেষ্টাও নহে। যে লঘু ভাব আমাদের জনসমাজে অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেশের অনিষ্ট করিতেছে তাহাই গল্প বা আখ্যানের আকারে লেখা হইয়া থাকে। যাঁহারা লেখেন, তাঁহারা দেশের এই অবস্থার জন্য নিরন্তর নিদারুণ বেদনা অনুভব করেন বলিয়াই আর কিছু ঢাকিয়া না রাখিয়া যাহা ঘটিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ রূপেই চিত্রিত করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য অসৎ নহে। হয়ত এমন দিনও আসিবে, এই তরুণেরাই সকল কিছু উপেক্ষা করিয়া দেশে যাঁহারা অর্থবলে বা পদবলে সাধু ও সচ্চরিত্র বলিয়া অনায়াসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের কথাও প্রকাশ্য ভাবেই আলোচনা করিবে। তরুণকে তাঁহাদের এইরূপ মনের অবস্থায় কোনও ভয় দেখাইলেই লাভ হইবে না। এই তরুণের দলই সকল দেশহিতকর কার্য্যে প্রাণ দেয়, সকল শাস্তি নীরবে ভোগ করে, তাহারা সত্যকে দেশের ও সমাজের হিতের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিতে অকুতভয়ে অগ্রসর হইবে। হয়ত দেশের একদল লোক পীড়ন করিয়া, নিন্দার শলাকা বিদ্ধ করিয়া ইঁহাদের শাস্তি দিতে সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু যে অবস্থায় দেশের সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহারই সূচনা মাত্র আজ বাঙলা দেশে। দেশের ও সমাজের অবস্থা তরুণের দলকে বেদনায় জর্জ্জরিত করিতেছে, যাঁহাদের মুখ চাহিয়া তাহারা এ যন্ত্রণা ভুলিতে পারে, তাঁহাদের মুখেও কোনও উচ্চ আদর্শের জ্যোতি দেখিতে পায় না, তাই আজ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াই তাহারা এই নিষ্ঠুর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে ইহাতে যদি গুরুজনের মনকষ্ট হয়, বা কাহারও কাহারও অপযশও হয় তাহাও তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত। তবু তাহারা তাহাদের সামর্থ্য মত এই 'অপকৃষ্ট' (? রচনার ভিতর দিয়াই বাঙলার মুখ ফিরাইবে, তাহাকে যশশোভায় প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।

তাহার পরিচয় আজই পাওয়া যাইতেছে। এই 'অপকৃষ্ট' লেখকদের মধ্যেই অনেকে আজ জনসাধারণের কাছে সমাদৃত। যাঁহারা তাহাদের কিছুকাল পূর্ব্বেও গায়ের জোরে নীচে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারাই তাহাদের রচনা প্রভৃতি সাদরে আহ্বান করিয়া লইতেছেন।

এই তরুণের দল চিরকাল এ দেশকে পরিচালনা করিয়াছে, দেশকে জয়যুক্ত করিয়াছে, আজও করিবে।

ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কথা, সংস্কৃত সাহিত্য বা প্রাচীন পদাবলী, গান, কাহিনী প্রভৃতি এই তরুণের দলই আজ বহু কষ্টে উদ্ধার ও অনুবাদ করিয়া বাঙলার জনসাধারণের পাঠযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

এই তরুণের দল বিদেশী ইতিহাস, নাটক বা সাহিত্যের রসসম্ভার বাঙলায় অনুবাদ করিয়া অনেক সংস্কারাবদ্ধ লোককে আরও উন্নত হইবার সাহায্য করিতেছেন এবং জনসাধারণের ভিতর তাহা নির্ম্মল আনন্দে পরিবেশন করিতেছেন। ইহাও কি তাঁহাদের অপরাধ?

এই তরুণের দল দেশী বিদেশী বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কত রূপে আজ দেশের উপকার সাধন করিতেছেন, কেহ কি মনে করিতে পারেন এ সকল সংস্কৃত না জানার কুফল?

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের ফটোখানি কলিকাতার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত টি, পি, সেন কর্তৃক গৃহীত।

কল্লোল
শ্রাবণ, ১৩৩৪

সকলি যে ভুলিয়াছি

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আজিকার রোদে রোদন ভুলেছি বৈশাখী সন্ধ্যার,
পদ্মার ঢেউয়ে পদ্ম ভাসায়ে গন্ধ ভুলেছি তার।

সকলি যে ভুলিয়াছি,—
কবে তুমি ছিলে মোর মধুচাকে উন্মন মউ-মাছি!
ফুলের সোসর দোসর পাইনু কবে সে বাসর-রাতে,
তোমার চোখের কাজল মেজেছি আমার আঁখির পাতে;
কবে তব কোলে কপোল রাখিয়া কপোলকল্পনায়,
ক্ষয়হীন রাতি গোঙাইনু দোঁহে অক্ষয়তৃতীয়ায়;—

কিছুই যে মনে নাই,
সোতের শ্যাওলা ঘাটে ঠেকেছিনু, আবার ভেসেছি ভাই।
বিদ্যুল্লতা-দ্যুতির দ্রুততা মন্থর মেঘে ঢাকা,
ব্যঞ্জন আজি আলুনি হয়েছে, কালকূট ঠোঁটে মাখা।

আজি ওগো প্রিয়সখি,
অলক্ষ্মী রাতে নাগে-কাটা শুধু লখিন্দরেরে লখি।
সরাইখানার সরা-র সরাব হঠাৎ গিয়াছে চুকে,
অনুরাধা তারা মুখ ঢাকিয়াছে অন্ধকারের মুখে।

আমি হেথা পরবাসী,
ভুলে গেছি সখি, সেই আশাতীত দূর ভাষা,—'ভালোবাসি।

মরুকুঞ্জ
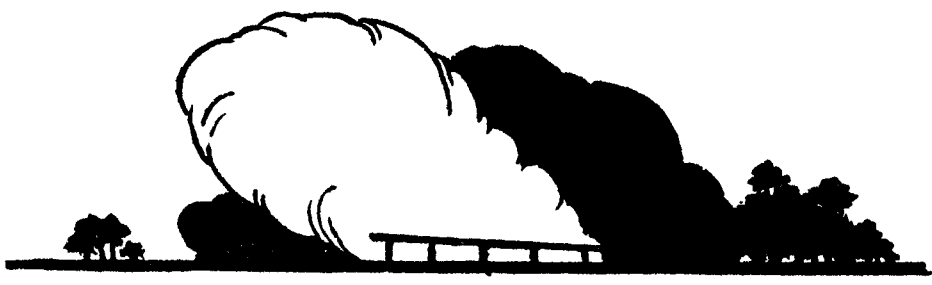
শ্রীসুরমা দেবী

ওগো শিপ্রা, ওসব সেলাই টেলাই এখন ফেলে থুয়ে জরা শব্দ রূপ করো দেখি—ষষ্ঠীর এক বচন আর পঞ্চমীর দ্বি বচন আর বহুবচন।

আঃ আপনার কি সব উল্টো পণ্ডিত মশাই, ওরকম অদ্ভুত করে প্রশ্ন কোরলে আমি কিছু বলতে টলতে পারবো না, তা স্পষ্টই বলছি—তার চেয়ে সোজাসুজি বলুন – জরা শব্দ রূপ কোরতে, top to bottom চোখের নিমেষে বলে দিচ্ছি।

মেয়ে-স্কুলের বৃদ্ধ পণ্ডিত, ছোট-বড় সব মেয়েদের কাছে এম্‌নি সম্মান প্রাপ্তি তাঁর প্রত্যহই ঘটে।

শিপ্রার ঝঙ্কারের উত্তরে তিনি বেশ শান্ত স্বরেই বল্লেন, না গো না, অমন জিগেস করায় লাভ কি? মুখস্থ করে এসে গড়গড়িয়ে বলে গেলে ত চলবে না—ভিতরে ঢুকতে হবে ত।

না পণ্ডিত মশায়, জরা শব্দের পিছনে মাথা ঘামাবার আমার অত সময় নেই; তার চেয়ে বরং আমার এই এম্‌ব্রয়ডারিটা আজ শেষ করি—যেটা উপকারে লাগবে।

আঃ, না শিপ্রা, তুমি প্রত্যহ আমার ক্লাশে বড় ফাঁকি দাও। গোল কোর না—যা জিগেস কোরছি বলো।

পণ্ডিত মশায়ের কথার উত্তরে সে নিতান্ত আব্দারের সুরে বল্লে, দেখুন না পণ্ডিত মশায়, আমার এই প্রজাপতির পাখনা দুটো স্কাই ব্লুতে কেমন মানিয়েছে!

পণ্ডিত মশায় এবার একটু জোর গলায় বল্লেন, তোমার সেলাই দেখার কথা আমার নয়—তুমি আমার ঘণ্টায় পড়বে কি না জানতে চাই।

শিপ্রা তাঁর চেয়েও এক পর্দ্দা চড়িয়ে বল্লে, ভাল বিপদেই পড়েছি বাবা! সারা ফার্স্ট্ ক্লাশে কি আমি ছাড়া আর মেয়ে নেই পণ্ডিত মশায়, যে, ক্লাশে ঢুকেই আজ আমার উপর সদয় দৃষ্টিপাত কোরেছেন!

ওদিকে পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে শিপ্রার যখন বাকযুদ্ধ চলছিল, আমরা প্রত্যেক মেয়েই মনোযোগ সহকারে কিছু-না-কিছু কাজ কোরছিলুম—তা সে পরের ঘণ্টায় মিস্ মিত্রের হিষ্ট্রি মুখস্থ করা থেকে আরম্ভ করে সঙ্গিনীদের খাতা থেকে সেইদিনকার হোম টাস্কের অঙ্কগুলো বেমালুম নিজেদের খাতায় টুকে নেওয়া পর্য্যন্ত। যাদের এসব বালাই ছিল না, তারা নতুন ঝকমকে মলাটের যে সব চিত্তাকর্ষক বই টেবিলের তলায় খুলে বসেছিল—সেগুলি যে ব্যাকরণ কৌমুদী মোটেই নয়, তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

শিপ্রা কিছুতেই পড়া না বলাতে তিনি হতাশ ভাবে

রেণুকে বল্লেন, তুমিই না হয় আজ আগে বল, শিপ্রা পরে বলবে 'খন।

রেণু চট্ করে হাতের রুমালটা গলায় জড়িয়ে নিয়ে বল্লে, ওঃ পণ্ডিত মশায়, টন্‌সিলাইটিসে যে কষ্ট আজ দুদিন পাচ্ছি, আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে—মীরা আজ বলুক না।

মীরা রোষ কটাক্ষে তার দিকে চেয়ে বল্লে, টন্‌সিলাইটিস্ তো তোমার হাত-ধরা আছে—এখনও আধঘণ্টা হয় নি, 'লনে' তো দিব্য ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিলে—আমার পা-টা বরং দেখো কি রকম ফুলেছে।

পণ্ডিত মশায় ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বল্লেন, পা ফুলেছে তা মুখে বলতে দোষ কি?

বাঃ বলি কি করে, দাঁড়াতে যে পারছি না!

আহা, বসেই বলো না ছাই!

কি যে বলেন আপনি পণ্ডিত মশায়, বসে বলব কি টিচারের সামনে—এতদিন স্কুলে পড়ছি, আমার কি কিছু ম্যানার্স্ জ্ঞান নেই!

অসহ্য বোধ হওয়াতে পণ্ডিত মশায় এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর সজোরে গোটা কয়েক চাপড় মেরে বল্লেন, You girls, you তোমরা অতি অমনোযোগী, ফাঁকিবাজ, অবাধ্য, আমার ক্লাশে কেউ পড়া করো না—যাচ্ছি মিস্ সেনের কাছে রিপোর্ট করবো—সকলের নামে একখুনি you—

রাগ হলে পণ্ডিত মশায়ের মুখে বাংলার চেয়ে ইংরেজি বুলিই জোগাত বেশি, তবে তার পর্যাবসান হত ঐ একমাত্র you কথাটির আধিক্যে।

কিন্তু তিনি যখন আজ সত্যই ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমরা প্রমাদ গুণলুম। মিস্ সেনের গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি এবং তার চেয়েও মারাত্মক তাঁর কঠোর তীব্র দৃষ্টি ও শ্লেষাত্মক কথাগুলি আমাদের মনে পড়ে গেল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে বিপদ-উদ্ধারের মতলব ঠিক করে শিপ্রাও ত্বরিত পদে পণ্ডিত মশায়ের পিছন নিলে।

তারপর যখন দারুণ অনুশোচনায় ব্যাকরণ খুলে মিস্ সেনের কাছে অফিস্ রুমে ডাক পড়বার আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত্ত রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাটাচ্ছি, আঙুলের ডগায় চুল জড়াতে জড়াতে খুব নির্ব্বিকার ভাবে শিপ্রা ক্লাশে ঢুকলো—পিছনে পণ্ডিত মশায়, মুখে তাঁর আবার পূর্ব্বের শান্ত ভাব, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের রুদ্রতার চিহ্নমাত্র নেই।

আমাদের বুক থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেল।

আমাদের এই পণ্ডিত মশায়টি দপ্ করে যেমনি জ্বলে উঠতেন, নিবতেও তেমনি তাঁর দেরী হত না—সেই জন্যে মেয়েরা তাঁকে ভয় কোরত খুব কমই। খর্ব্বাকৃতি, জীর্ণ শীর্ণ এই বৃদ্ধটির চেহারা, পোষাক ও চালচলনের মধ্যে শিক্ষক-জনোচিত না ছিল কোন গাম্ভীর্য্য—না ছিল কোন কঠোরতা। মেয়েরা সে জন্য অবশ্য যথেষ্ট সুবিধা নিত। তাকে নিতান্ত গল্পপ্রিয় জেনে নানা বাজে গল্পের অবতারণা করে ছোট-বড় সব ক্লাশের মেয়েরাই প্রত্যহ তাঁর ঘণ্টাটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা কোরত।

মাঝে মাঝে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে তিনি বলতেন, তোমরা বাপু, আমার ক্লাশে বড্ডই ফাঁকি দাও!—কই অন্য টিচারদের মত আমাকে ত ভয় করো না!

মেয়েরা বোলত, আপনি যে তাঁদের মত বকেন না পণ্ডিত মশায়!

তিনি একটু চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, তোমরা যে হলে গো 'ফেয়ার সেক্স'!

অতএব fair sex-রা নির্ব্বিবাদেই পণ্ডিত মশায়ের ক্লাশে ফাঁকি দিতেন।

পণ্ডিত মশায়কে ফিরে আসতে দেখে আমাদের পূর্ব্বের অনুশোচনা কর্পূরের মত উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণখানাও যথাস্থানে ফিরে গেল।

শিপ্রা বল্লে, ওঃ, পণ্ডিতমশায় একেবারে অফিস রুমের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলেন—আর একটু হলেই—বাস্‌রে! মিস্ সেনের সারমন্ প-ঁ-চা-ত্তি-শ-টি মিনিট ধরে—খুব সময় গিয়ে পড়েছিলুল যা-হোক বাবাঃ! আপনারই বা কি আক্কেল পণ্ডিত মশায়, সটান্ চল্লেন মিস্ সেনের কাছে লাগাতে—ঠিক যেন দুর্ব্বাসা মুনির সেকেণ্ড এডিশন! আপনি পণ্ডিত মানুষ—কত শাস্ত্র পড়েছেন আর রিপু জয় কোরতে শেখেন নি, অ্যাঁ?

আবার! ফের! এই মাত্র না তুমি ক্লাশের সবায়ের

হয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইলে। শিপ্রা, you বড় নির্লজ্জা—অতি দুর্বিনীতা, দুঃশীলা প্রকৃতির চঞ্চলা স্ত্রীলোক। আমার সঙ্গে ঠাট্টা?

আমাদের ক্লাশের এই শিপ্রা মেয়েটির সঙ্গে পণ্ডিত মশায়ের এক মিনিটের জন্য বনিবনা হোত না—কারণ এই তন্বী কিশোরীর কৌতুকপ্রিয়তার মধ্যে এমন একটা বালকোচিত সবল দুষ্টুবুদ্ধি ছিল যার অত্যাচার পণ্ডিত মশায়ের মত নিরীহ প্রকৃতির পক্ষে বরদাস্ত করা সময়ে সময়ে নিতান্ত কঠিন হয়ে উঠত।

কিন্তু স্বভাবটি ছিল তাঁর এমনই মিষ্টি যে, কারুর উপর রাগ করা তাঁর আদৌ পোষাত না—শিপ্রার উপর ত নয়ই; কারণ, তাঁকে সময় সময় বিরক্ত কোরলেও তাঁর উপর শিপ্রার যে শ্রদ্ধা ও মমতাবোধ যথেষ্টই আছে—একথা পণ্ডিত মশায়ের অজানা ছিল না। সেবার যখন সস্তা দামের পিতলের ফ্রেমে সাধারণ কাঁচ বসান চশমাখানি দড়ি দিয়ে মাথায় বেঁধে তিনি ক্লাশে এসেছিলেন—আমাদের সঙ্গে সমানে সেদিন হাসলেও শিপ্রা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলেছিল, পণ্ডিত মশায়, আমার মায়ের চোখে চালসে ধরায় তিনি একখানা ভাল রূপোর চশমা করিয়েছেন বটে, তবে পরেন না। কাল আমি আপনাকে সেটা এনে দেবো—ওটা ফেলে দিন।

পরদিন চশমাটি চোখে দিয়ে পণ্ডিত মশায় সরল হেসে বল্লেন, বাঃ, এত চমৎকার লেগেছে আমার চোখে যে সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। তা শিপ্রা একটু চঞ্চলা প্রকৃতির দুর্বিনীতা আছে বটে তবে ওর মনটি একেবারে সাদা—না? কি বল গো তোমরা?

তারপর থেকে পণ্ডিত মশায়ের কোন কিছু প্রয়োজন হলেই তিনি শিপ্রার কাছে পরামর্শ চাইতেন। বেশ মনে পড়ে, সেবার পৌষের কনকনে শীতে বাতের বেদনাটা বাড়তেই কার পরামর্শ শুনে তিনি একদিন ক্লাশে এসে শিপ্রাকে বল্লেন, পেটরোল মালিশে শুনলুম ব্যথা মরে, কি করি বলো তো শিপ্রা?

সে তৎক্ষণাৎ অভয় দিয়ে বল্লে, আমি কালই আমাদের গাড়ীর টিন থেকে এক শিশি ঢেলে আনবো—কিছু ভাববেন না পণ্ডিত মশায়।

যদিও ক্ষণিকের জন্য, তবুও মাঝে মাঝে শিপ্রার উপর তাঁকে চটে উঠতে হত—বুড়ো মানুষ কতক্ষণ সহ্য করেন?

তাঁকে আবার রাগতে দেখে আমি তাড়াতাড়ি বল্লেম, আচ্ছা মীরা, তুমি যে তখন প্ল্যানচেট সম্বন্ধে পণ্ডিত মশায়কে কি জিগেস কোরবে বলছিলে?

ঘণ্টা কাটাবার জন্যে আজ প্ল্যানচেটের মিথ্যা গল্প অবতারণা করবার পরামর্শ আমাদের আগে থাকতেই স্থির হয়েছিল।

সুযোগ বুঝে মীরা প্ল্যানচেটের গল্প সাড়ম্বরে আরম্ভ করবার মুহূর্ত্তেই দুর্ভাগ্যক্রমে সিঁড়ির কাছে যুগপৎ মিস্ সেনের পায়ের শব্দ ও তীক্ষ্ণ মেমিয়ানা অনুনাসিক কণ্ঠস্বর কানে এলো, দা-ব-ও-য়া-ন, দা-র-ও-য়া-ন!

পাশের ক্লাশে তিনি পড়াতে আসছেন।

নিমেষেই আমাদের ভিন্নরূপ—নিতান্তই মনোযোগী বাধ্য ছাত্রী! পণ্ডিত মশায় শশব্যস্তে হেঁকে বল্লেন, ওগো, এবার একটা পাদপূরণ করো দেখি শুনি।

শিপ্রা আমার কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি বল্লে, পণ্ডিত মশায়ের ডাকের কায়দা আছে বটে—আমরা নাকি ওঁর 'ওগো'!

ভ্রূকুটি করে তার দিকে চাইতেই সে একটু হেসে চুপ কোরলো।

ঘরের সামনে দিয়ে বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ এবং ডান হাতে একখানি বই বুকের কাছে তুলে ধরে মিস্ সেন ধীর-মন্থর গতিতে চলে গেলেন—চশমার আড়াল হতে চোখ ঘুরিয়ে আমাদের উপর অন্তরভেদী দৃষ্টি বুলিয়ে নিতেও ভুল্লেন না।

পণ্ডিত মশায় একবার আড়চোখে তাঁর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বল্লেন, আর গোল কোর না, বুঝলে? কাল উনি বলছিলেন যে, ক্লাশে আমি ডিসিপ্লিন রাখতে পারি না। তার পর চেঁচিয়ে বল্লেন, আচ্ছা, এই লাইনটির পাদপূরণ করো তো—না হেরে হয়েছি কাতর ওরূপ মাধুরী—ঠিক এর সঙ্গে প্রত্যেক অক্ষরে সমান করে মিল রাখা চাই, এবং মানেরও মিল থাকবে।

'না হেরে হয়েছি কাতর ওরূপ মাধুরী।' আমরা প্রত্যেকেই মাধুরীর মিল খুঁজতে মনের মধ্যে কথার মালা গাঁথতে সুরু কোরলুম। ক্লাশ নিস্তব্ধ। একটু অপেক্ষা করে পণ্ডিত মশায় হাঁকলেন—

কই গো—তোমাদের মাথায় যে বাড়ি পড়লো দেখি—

তবুও নিঝুম। হঠাৎ শিপ্রা লাফিয়ে উঠলো, মিস্ সেনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এনব্রয়ডারীর প্রজাপতির উপর তার দরদ একেবারে লোপ পেয়েছিল। সে বল্লে, আমি বলি পণ্ডিত মশায়?

পণ্ডিত মশায় বল্লেন, ও, শিপ্রা তো এবার দেখছি খুবই তৎপর।

সে বল্লে, হ্যাঁ পণ্ডিত মশায়, কবিতা মেলাতে আমি খুব পারি ও আপনার স্যত স্যাথস্-এর মত অমন প্রলয় ব্যাপার নয়। বলি তাহলে?

সবায়ের দিকে সগর্ব্বে চেয়ে শিপ্রা একটানা সুরে বলে গেল—

না হেরে হয়েছি কাতর ওরূপ মাধুরী
কঙ্কালসার হয়েছি মোরা না খেয়ে কচুরী।

পণ্ডিত মশায় বিস্মিত হয়ে "অ্যাঁ" বলে তার দিকে চাইতেই সে নির্ব্বিকার ভাবেই দ্রুত পুনরাবৃত্তি কোরলে। পাশের ক্লাশে মিস্ সেনের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে আমরা খিলখিল করে হেসে উঠলুম।

চুপ—বলে সকলকে থামিয়ে পণ্ডিত মশায় বিরক্ত হয়ে ভ্রূকুটি করে বল্লেন, আঃ, তোমার সঙ্গে আর পারি না শিপ্রা, তুমি একেবারে ইনকোরিজিবল, তোমার মধ্যে কণামাত্র কবিত্ব নেই যখন, কেন অত বক বক করো বলো তো! ছি ছি, মাধুরীর সঙ্গে কচুরী মিলিয়ে তুমি এর রসটাকেই নষ্ট কোরলে? কি আক্কেল তোমার, অ্যাঁ?

বাস্তবিক মাধুরীর সাথে কিন্নরী, অপ্সরী, সুন্দরী— এমন কি কুকুরীও মাথায় এসেছিল—কিন্তু কচুরী? আঃ চমৎকার!—

কৃষ্ণা স্কুলের হাতে-লেখা মাসিকে মাঝে মাঝে কবিতা লিখত। মিলের অনুসন্ধানে সে যে ভাবরাজ্যে বিচরণ কোরছিল তা তাকে দেখে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছিলুম। চোখ দুটি তার কড়ির দিকে নিবদ্ধ, দৃষ্টি উদাস, যেন 'কোন্ সুদূরের পিয়াসী'—হাতের পেনসিলটি দাঁতে চাপা, নিতান্ত কবি-ভাব। পণ্ডিত মশায় তাকে বল্লেন, কৃষ্ণা, তুমি বলতে পারবে কি?

সে মিনতি করে আরো একটু সময় চাইলো। মনে হোল, তার স্বরটা যেন একটু দূর থেকে ভেসে আসছে।

ললিতা তখন বল্লে—

না হেরে হয়েছি কাতর ওরূপ মাধুরী
উদরের ক্ষুধা আর নিদ নিল হরি।

হয়েছে তো পণ্ডিত মশায়?

মনে মনে লাইন দুটো আবৃত্তি করে তিনি বল্লেন, বেশ হয়েছে, ললিতা শিপ্রার চেয়ে ঢের ভাল। ওরূপ চঞ্চলা প্রকৃতির স্ত্রীলোকের দ্বারা কোন কাজ হয় না। তবে তুমি একটু যে ভুল কোরলে বাপু—কাব্যের ন্যায় ললিত-কলায় উদরের ক্ষুধার মত উৎকট শব্দ প্রয়োগ কোরলে মাধুর্য্য যে একেবারে যায়…

ইত্যবসরে কৃষ্ণা কড়িকাঠ থেকে তার উদাস দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছিল, সে বল্লে, একটা ঠিক করেছি পণ্ডিত মশায়, আমি বলি?—জীবনে কভু না যেন তোমারে পাশরি।

পণ্ডিত মশায় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিজের মনেই এই চরণ দুটি আবৃত্তি কোরতে লাগলেন…বল্লেন, চমৎকার! ঠিক সময়োচিত না হলেও পদটির মধ্যে মাধুর্য্য আছে— তোমার আর ললিতার শক্তি আছে দেখছি। আহা! রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র কি কবিতাই না লিখে গেছেন… মরি মরি! ভাব গদ গদ হয়ে পণ্ডিত মশায় দু চক্ষু বুঁজে গুণাকরের রচনা প্রাণের আবেগ দিয়ে ধীরে ধীরে টেনে টেনে আবৃত্তি করছিলেন, এমন সময় মূর্ত্তিমতী গন্ডের মত শিপ্রা তার স্বভাবসিদ্ধ বালক-কণ্ঠে বলে উঠলো, পণ্ডিত মশায়, আর একটা মনে এসেছে, বলব কি?

পণ্ডিত মশায় চমকে উঠে চোখ খুলেই টেবিল চাপড়ে, আঃ, you চুপ, গোল করো কেন? স্বপ্নরাজ্য থেকে হঠাৎ স্থানচ্যুত হওয়ায় তাঁর মনটা বিরস হয়ে গেল। বল্লেন, আর পাদপূরণ করে কাজ নেই—ওতে তোমরা বড় গোল

কস্নো—হিতোপদেশখানা খুলে বিশুদ্ধ উচ্চারণে রিডিং পড়ে মানে বলো।

পাশের ঘরে মিস্ সেনের অস্তিত্ব স্মরণ করে আমরা আর আপত্তির অবসর পেলুম না। আমরা বই বার কোরলুম আর পণ্ডিত মশায় টেবিলে দু হাতের উপর মাথাটা রেখে ঝুঁকে পড়লেন; সম্ভবত রায় গুণাকরের কাব্য-মাধুর্য্যের ঘোরে তাঁর মাথাটা তখনও টলছিল।

বেশীক্ষণ পড়তে হয় নি, দু একজনের পড়া শোনবার পরই পণ্ডিত মশায় এমন অবস্থায় উপনীত হলেন যে, তাঁর দিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন আর আমাদের হোল না।

হঠাৎ অনেকগুলি জুতোর একসঙ্গে মশমশ শব্দ হওয়াতে পণ্ডিত মশায় তাড়াতাড়ি মাথা না তুলেই ক্লান্ত কণ্ঠে বল্লেন, Next!

শিপ্রা যথারীতি এই সুযোগটির অপেক্ষাতেই ছিল। বল্লে, নেক্সট্-এর আর সময় কোথায় পণ্ডিত মশায়—টিফিনের ঘণ্টা যে বেজে গেল।

আমরা হেসে উঠলুম।

নিতান্ত অপ্রতিভ ভাবে বইখানা হাতে তুলে নিয়ে অসম্ভব দ্রুত গতিতে পণ্ডিত মশায় ক্লাশ ছেড়ে চলে গেলেন।

নিত্যই এমনি—পণ্ডিতে ও ছাত্রীতে।

দুই

দিন যায়।

টেষ্ট হয়ে গেছে—উদ্বেগে ও আশঙ্কায় ফলাফলের প্রতীক্ষা করছি। স্কুলে নিত্যই আসি তবে পড়ার কোন বালাই ছিল না।

টিফিনের ছুটি। জলযোগ সেরে একখানা বই হাতে করে 'কমন রুম'-এ গিয়ে বসেছি অথচ তাতে মন দিতে পারছিলুম না।

সশব্দে ভেজান-দরজাটা খুলে যেতেই চমকে চেয়ে দেখি শিপ্রা—সেই 'দুর্ব্বিনীতা দুঃশীলা প্রকৃতির চঞ্চলা স্ত্রীলোক' ধীরে ধীরে কোন কাজ যেন তার দ্বারায় হয় না—ভক্তি-দি যে বলেন, শিপ্রার হাতে পায়ে যেন লক্ষী খেলে—সে কথা খুবই সত্যি। বিরক্ত হয়ে কিছু বলবার আগেই সে আমার হাত দুটো ধরে সজোরে টানতে টানতে বল্লে, ওঃ কমলা, তোকে যে কত খুঁজেছি জানিস্ না—একেবারে হায়রাণ হয়ে গেছি; চ ওঠ্, বড় মজা, পণ্ডিত মশায়কে ধরে এনেছি, তাঁকে দিয়ে আজ গান করাব।

পণ্ডিতের গান! অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলুম। টেনে টেনে রায় গুণাকরের কবিতা আবৃত্তি কোরতে তাঁকে অনেকবার শুনেছি বটে কিন্তু গান!

শিপ্রা আমার পিঠে এক ধাক্কা দিয়ে বল্লে, ধ্যাৎ, কি হাঁদার মত দেখছিস—তুই বাপু বড় স্লো—ওঠ্ না চটপট—এতক্ষণে মীরা, অণিতা, সরযূ সকলে এসে গেছে। কত কষ্টে, হাতে পায়ে ধরে পণ্ডিত মশায়কে যে রাজি করিয়েছি...

উঠলুম।

মনে স্ফূর্ত্তি ছিল না। বল্লুম, কেন ভাই আর বুড়ো মানুষকে জ্বালাস্?

দু দুটো সিঁড়ি টপকে উঠতে উঠতে সে আমায় বাধা দিয়ে বল্লে, দোহাই কমলি, তুই আর সারমন্ ঝাড়িস্ নি—রেজাল্ট বেরুলে তো চলে যেতে হবেই, যে কদিন আছি একটু আমোদ করে নি।

ক্লাশে তখন গান আরম্ভ হয়ে গেছে—

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্..."

গানটির অর্থ দুর্ব্বোধ্য কিন্তু বিশুদ্ধ উচ্চারণ ভঙ্গিমায়, ছন্দলালিত্যে, শব্দ ঝঙ্কারে ও পণ্ডিত মশায়ের মধুর কণ্ঠের তান লয়ে গানটি এতই মিষ্টি লাগলো যে, মেয়েদের ভিড় কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলুম।

তিনি তখন ভাববিভোর হয়ে অর্দ্ধনিমীলিত চোখে গাইছেন—

স্থলকমল গঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম
দেহি পদপল্লবমুদারম্" (শ্রীরাধে)

পণ্ডিত মশায় বারে বারে "জয় রাধে, শ্রীরাধে" এই আখর দিয়ে শেষের লাইনটি অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে গাইতে লাগলেন।

শিপ্রার নিমন্ত্রণে যে ক'জন মেয়ে তাঁর চারপাশে মৌমাছির মত জড় হয়েছিল—তাদের মুখে চোখে কৌতুকের হাসি ঝলমল করে উঠলো। পণ্ডিত মশায়ের আবেশ বিহ্বল মুখের দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ রোধ কোরতে কেউ বা মুখে কাপড় গুঁজলে আর কেউ কেউ কড়িকাঠের দিকে চেয়ে গাম্ভীর্য্যের ভাণ করবার চেষ্টা কোরলে। কোন রকমে যারা হাসির টাল সামলাতে পারলে না—তারা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে টেবিলে তাল দিতে লাগলো।

গান শেষ হতেই সবাকার যেন মুখপাত্র হয়েই শিপ্রা বলে উঠলো, বাঃ পণ্ডিত মশায়, চমৎকার, ! আপনার এমন গানের কাছে কি আর অণিমা ঘোষ দাঁড়াতে পারে? ফোঃ ফোঃ।

সকলেই সমস্বরে বলে উঠলো, পণ্ডিত মশায়ের কাছে অণিমা—ছিঃ—

গানে অণিমার খ্যাতি ছিল—প্রতি বছর গানের মেডেল-গুলি তার গলাতেই দুলতো।

মেয়েদের ব্যাজস্তুতিতে পণ্ডিত মশায় খুব খুসী হয়ে বল্লেন, বয়সকালে সঙ্গীতাদি কিছু শিক্ষা করেছিলুম—এখন বার্দ্ধক্যে আর আমার সে গলার কিই বা আছে—না আছে জোর, না আছে পূর্ব্বেকার সে মিষ্টতা। কৈশোরের অভ্যেস তো আর যৌবনে রাখতে পারলুম না।

কৌতুক রঙ্গে অন্য সহপাঠিনীদের মত গান শুনতে আমিও দলে জুটেছিলুম—কিন্তু পণ্ডিত মশায়ের গাওয়ার মধ্যে এমন একটা আবেশ বিহ্বল আবেদনের সুর আমার মনে বাজল—যার ফলে আমি আর তাদের হাস্য বিদ্রূপে যোগ দিতে পারলুম না। আমি জিগেস করলুম, বড় হয়ে আপনি কেন চর্চ্চা কোরলেন না পণ্ডিত মশায়?

তিনি একটু হেসে মাথা দুলিয়ে বল্লেন, জীবন-সংগ্রাম, কমলা, বুঝলে না? জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করে আজ অবধি অন্ন আহরণ করে সংসার প্রতিপালন কোরতে কোরতে মাথার চুলে পাক ধরলো। আমাদের বাঙলা গৃহস্থ ঘরে ওসব সুকুমার কলার চর্চ্চা করবার অবসর আর এ জীবনে ঘটে কই—পদার্থ থাকলেও নষ্টই হয়ে যায়—বুঝছো না!

পারুল হঠাৎ বলে উঠলো, পণ্ডিত মশায়, আপনার ও ক্যাড়র ম্যাড়র গানের এক বর্ণও বুঝলুম না—এবার একটা বাঙলা গান গাইতে হবে কিন্তু।

তিনি হাসি মুখে বল্লেন, আমি হলুম গে পণ্ডিত মানুষ, —সংস্কৃত নিয়েই জীবন কাটালুম—সংস্কৃত পদাবলী ছাড়া বাঙলা গান আমি জানব কি করে—আর সময়ও তো নেই।

মেয়েরা নিতান্ত জিদ ধরলে—আর মেয়েদের চিরবাধ্য পণ্ডিত মশায়ও একবার আপত্তি করে মৃদু কণ্ঠে গান সুরু কোরলেন—

"আমার যাবার সময় হল
আমায় কেন রাখিস্ ধরে"...

গান শেষ হবার আগেই ঘণ্টা বেজে উঠলো।

হাসি উচ্ছ্বাস ও তুমুল কলরবের মধ্যে নতুন কৌতুকের অন্বেষণে সঙ্গিনীরা পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একলা ঘরে বসে বসে কেবলই পণ্ডিত মশায়ের কথা ভাবছিলুম। কানের মধ্যে থেকে বাজছিল "দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"—আর কি জানি কেন শুধুই মনে হচ্ছিল, আমরা ছোটবেলা থেকে যে নিদ্রাতুর ব্যক্তিত্বহীন নিরীহ বৃদ্ধটিকে আজ অবধি সমানে দেখে আসছি—তাঁর যেন এ ছাড়াও আরো একটা রূপ আছে।

তিন

সংস্কৃতের ক্লাশে ফাঁকি দেবার ফল বিশেষ করেই ফললো। দু একটি ছাড়া ক্লাশের সব মেয়েই ফেল্!

মিস্ সেন সে সুযোগ ছাড়েন নি—লাঞ্ছনার অবধি রইল না—চির-কৌতুকময়ী অদম্য শিপ্রার চোখেও সেদিন জল দেখা গিয়েছিল।

পণ্ডিত মশায়কে ধরে পড়লুম বাড়ীতে দুমাস পড়াতে হবে—তা না হলে যে পাশ হওয়া দায়।

আমার উপর পণ্ডিত মশায়ের প্রীতি ছিল যথেষ্ট—মাঝে মাঝে আমার তুলনা দিয়ে তিনি শিপ্রাকে বলতেন, তোমার ও পুরুষালি প্রকৃতি ত্যাগ করে কমলার মত হও দিকি—

নামেও কমলা, কাজেও তাই—স্ত্রীলোকজনোচিত সর্ব্বগুণে বিভূষিতা !

এর উত্তরে শিপ্রা অবশ্য আমায় তাঁর সামনেই গুটি কয়েক কীল বসিয়ে দিতো।

অনুরোধ মাত্রেই পণ্ডিত মশায় আমায় অভয় দিলেন যে, মাসিক সাতটি মুদ্রার বিনিময়ে তিনি আমায় ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করিয়ে দেবেন !

* * * *

সপ্তাহে তিনদিন পণ্ডিত মশায় সন্ধ্যাবেলা নিয়মিত আসেন, আমারও মনোযোগ অখণ্ড—কারণ দায় এবার আমারই।

সেদিন তাঁর দেরী দেখে বিকেলের ডাকে পাওয়া শিপ্রার দীর্ঘ চিঠিখানা আবার পড়ছিলুম—সব রকম দুষ্টুমি বন্ধ করে সবক্ষণ পরীক্ষার পাঠ তৈরী কোরতে বাধ্য হওয়ায় যমযন্ত্রণা যে কি জিনিষ তার একটা "ফেয়ার আইডিয়া" তার এ পৃথিবীতেই হয়ে গেছে—পরে ইউনিভারসিটি পরীক্ষা এবং অভিভাবকদের অভিশম্পাৎ করে—এর চেয়ে বিয়ে হয়ে গিয়ে শাশুড়ীর লাঞ্ছনা এবং স্বামীর ফরমাস খাটাও যে কত লোভনীয় তার একটা সুললিত বর্ণনা দিতেও ভোলে নি—সবশেষে সে লিখেছে মনীষার কথা। যে ছেলেটিকে সে ভালবাসে এবং যার সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক এত দিন ধরে হয়েছিল—ব্যবসায় ক্ষতি হওয়ায় আজ সে নিঃস্ব—বাইরের দিক থেকে দাম ছিল তার শুধু অর্থের, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তার একটিও ছিল না—তাই মনীষার মা-বাপ আজ সে ছেলেটির উপর বিরূপ—ভবিষ্যতে জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেও সবায়ের অমতে মনীষা নাকি তাকে বিয়ে কোরতে চায়। তাকে এজন্যে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় বরণ করে ভালবাসা সম্বন্ধে যে সব গভীর চিন্তাপূর্ণ তথ্য লিখে শিপ্রা চিঠিখানা শেষ কোরেছে—তা যে তার মত দুঃশীলা প্রকৃতির চঞ্চলা স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাবা কোন দিন সম্ভবপর—এ কথা যেন বিশ্বাস করাও দুষ্কর। পরীক্ষার পড়ার চাপ কি তাকে মাসের মধ্যে সত্যই বিজ্ঞ কোরে তুলে ?

থেকে থেকে সেকেণ্ড ক্লাশের মনীষা মেয়েটিকে মনে পড়ছিল—নিরীহ শান্ত সে মেয়েটি। মিষ্টি স্বভাবের জন্যে সে ছিল সবায়ের প্রিয়।

জরাজীর্ণ তিনটা তালি আঁটা মলিন সাদা ছাতাটিকে দেয়ালের কোণে ঠেস দিয়ে রেখে—চৌকিতে বসেই পণ্ডিত মশায় বল্লেন, তোমার ব্যাকরণখানা আগে খোল গো—সাহিত্য পরে হবে। আজ পথে একটি দেশের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় কথা বলতে বলতে বড় বিলম্ব হয়ে গেল।

তাঁর মুখখানা আজ যেন কিছু ম্লান বলে মনে হল। বল্লুম, একটু জিরোন পণ্ডিত মশায়, এইমাত্র তো এলেন.. হ্যাঁ, আজ শিপ্রার একটা চিঠি পেয়েছি।

তিনি বেশ আগ্রহ করেই বল্লেন, কি লিখেছে ?

বল্লুম,—পরীক্ষার ভারে বেচারী বড় দমে গেছে, লিখেছে এর চেয়ে অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়াও ছিল ভাল।

তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন,—বড় কথাই বলেছে কমলা, অ্যাঁ বিয়ে হয়ে যাওয়া ভাল !

তিনি আবার হাসতে লাগলেন। তারপর সস্নেহে বল্লেন, বড় চঞ্চলা প্রকৃতি কি না, তা বালিকা বই ত নয়, স্কুলের খেলাধুলো গল্প গুজব বন্ধ হয়ে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে, ও বেশ পাশ হয়ে যাবে কমলা—চঞ্চলা হলেও মেয়েটি বড় বুদ্ধিমতী।

এবার মনীষার কথা তুল্লুম,—তিনি বল্লেন, কই সে ত আর স্কুলে আসে না, তার হয়েছে কি ?

তখন আমি তাঁকে মনীষার সব কথা খুলে বল্লুম। তার মত শান্ত মেয়ের পক্ষে এতখানি দুঃসাহস করা যে সম্ভব তা ভেবে প্রথমটা তিনি দারুণ বিস্মিত হলেন—পরে বল্লেন, তা মনীষা যখন স্বেচ্ছায় তাকে ভালবেসে গ্রহণ কোরছে তখন তাদের মধ্যে হয় ত একটা প্রগাঢ় মনের বন্ধনের সূত্রপাত হয়েছে।

কি জানি কেন মনীষার এ কাজটা আমি কিছুতেই সমর্থন কোরতে পারছিলুম না—বল্লুম, আজ ঝোঁকের মাথায় ও যে কাজ কোরছে, আমার ভয় হয় ভবিষ্যতে ও ঠিক সুখী হতে পারবে কি না।

পণ্ডিত মশায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন—তাঁর মুখে সেই সরল ম্লান হাসিটি ফুটে উঠলো—বল্লেন, দারিদ্র্য কষ্ট হয় ত পাবে কিন্তু তাতে ওদের মনের সুখের ব্যাত্যয় হবে কেন? না আমার মনে হয় কমলা, এ বৃত্তিটা আজও তোমার মধ্যে অস্ফুট, তাই এটা যে কত বড় জিনিষ তা তুমি বুঝতে পারছো না।... মনে হল তাঁর প্রতিকথার মধ্যে যেন একটা গভীবতার ছাপ রয়েছে—তুচ্ছ হাসি-গল্পের কথা ছাড়া তাঁকে কখনও এমন গম্ভীর ভাবে কথা বলতে শুনি নি—তাই কেমন যেন একটু নতুন ঠেকলো।

দুজনেই চুপ করে রইলুম। মনে হল দু একবাব কি বলবার চেষ্টা করে তিনি যেন থেমে গেলেন। পণ্ডিত মশায়ের এ ভিন্ন রূপ দেখে কেমন অস্বোস্তি বোধ হচ্ছিল।

হঠাং নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনি বল্লেন, হ্যাঁ কমলা, তোমার বয়স কি ষোল হয়েছে?

আশ্চর্য্য বোধ হল। হঠাং আমার বয়সের কথা! হেসে বল্লুম, ষোল কি পণ্ডিত মশায়, আঠারো হয়ে গেল যে!

ও তাই নাকি! দেখো কমলা, শাস্ত্রে বলে ষোল বছর পার হলে পুত্রীও পিতার বন্ধু হয়ে যেতে পারে। তুমি আমার কন্যা স্থানীয়া, আমার জীবনের একটা গোপন কথা যদি তোমায় বলি তাহলে হয় ত দোষ হবে না। মনীষার আজকের মনের অবস্থা আমি সম্যক্ উপলব্ধি কোরছি, কারণ এ রকম অভিজ্ঞতা আমারও একবার ঘটেছিল আর আজ এত বয়সেও তাকে ভুলতে পারি নি।

তিনি আবার চুপ কোরলেন।

পণ্ডিতের প্রেম! যুগপৎ অদম্য বিস্ময় ও কৌতূহলে অভিভূত হয়ে পড়লুম—এই আঠারো বছরের জীবনে বিস্ময়কর অনেক কিছু জানবার ও দেখবার সুযোগ হয়েছে— —কিন্তু ... পণ্ডিত মশায় ভালবাসেন কাকে? ...

আমি কোন কথা বলবার আগেই তিনি নিতান্ত মৃদুকণ্ঠে যেন আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন—

বিয়ের রাতেই অত মেয়ের মাঝে গোলাপকে দেখে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলুম—ওঃ, সে কি রূপ? তোমায় আমি বলতে পারি না। প্রস্ফুটিত গোলাপের মতই তার বর্ণ আর চোখ দুটি পদ্ম কোরকের মত—ছোট বোনের বিয়ের দিন ওরূপ উৎসব আমোদে সুসজ্জিতা স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাকে দেখাচ্ছিল যেন প্রাণহীন শুষ্ক একটি পুষ্প। বহুদিন গত হোল আমার বিয়ের রাতে বাসরঘরের বাইরে গোলাপ যেমন মুখখানি ম্লান করে দাঁড়িয়েছিল আজও আমার তা স্পষ্টই মনে আছে। স্ত্রীলোকেরা ঘরের ভিতর আমাকে নিয়ে কৌতুক করছিল, হয় ত ইচ্ছা সত্বেও ঘরে ঢুকতে সে সাহস পায় নি, কারণ হিন্দু ঘরের বিধবা সে—জানে তার তপ্ত নিঃশ্বাসে শুভ কাজ পণ্ড হয়ে যায়।

তোমায় বলতে দ্বিধা নেই কমলা, তোমার পণ্ডিত-মা'কে আমার মোটেই ভাল লাগে নি। সে বড় কালো—বিয়ের আগেই শুনেছিলুম; কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা তো লঙ্ঘন কোরতে পারি না।

বিয়ের আটদিন পরে জোড়ে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে দেখি তাদের বাড়ী বেশ খালি হয়ে গেছে। এই ক'দিনে তোমার পণ্ডিত মা র কাছ থেকে গোলাপের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলুম। এগার বছর বয়সে বিয়ের দুমাস পরে হাতের নোয়া খুলে, মাথার সিঁদূর মুছে সে কেমন করে বাড়ীতে ফিরে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ওদের ওখানে আর যেতে হবে না মা, ওরা বলে দিয়েছে। বাঁচলুম মা! খেলতে দেবে না, কথা কইতে দেবে না, শুধু ঘোমটা দিয়ে বসে থাকো আর ফবমাস খাটো—সে কি মা আমি পারি? তার কথা শুনে সকলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। সে প্রথমটা কেমন অবাক হয়ে গেল, তারপর তাদের সকলের গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, তোমরা কাঁদছো কেন, আমি ত এবার থেকে এখানেই থাকবো।—অবোধ শিশু! সেদিন ত কিছু বোঝে নি।

তারপর সে কত কাঁদাকাটা করে ঠাকুর-মা'র হেঁসেলে তাঁর দলে যে ভর্ত্তি হল সে কথাও শুনলুম—

তার উপর কেমন একটা মমতা জন্মে গেল; সমস্ত মন দিয়ে তার ম্লান মুখে হাসি ফুটাবার ইচ্ছা কোরত। তাই এবার নিজে গিয়ে তার সঙ্গে ভাব কোরলুম। প্রথম বিষম সংকোচে সে দূরে সরে থাকতো, কথা বলতো সামান্যই কিন্তু আমি বেশ বুঝতুম, আমার মমতাপূর্ণ ব্যবহার তার খুবই ভাল লাগে।

নতুন বিয়ে হয়েছিল এবং আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম, কাজেই বিকেল বেলা তোমার পণ্ডিত-মা'কে সাজাবার ঘটাটা হত খুবই বেশী। তাদের সাজসজ্জা হাসি রঙ্গের মাঝ থেকে নিরাভরণা বিষাদময়ী গোলাপকে সব্বার অছিলায় বলতুম, দিদি, রামায়ণখানা আন তো দেখি—ঠাকুর-মাকে আজ কতখানি শোনালে ?

কয়েকদিন সেখানে কাটাবার পরই আমি বুঝলুম, বাড়ীর কারুর কাছ থেকেই সে মিষ্ট ব্যবহার পায় না।

মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি পণ্ডিত মশায়ের গল্প শুনছিলুম—মাঝে মাঝে সাদা থান পরা নিরাভরণা ম্লানমুখী কিশোরীর একখানি কচি মুখ মনে ভাসছিল কিন্তু মুহূর্ত্তের মত। পর ক্ষণেই চোখে ভাসছিল লীলা-চঞ্চলা হাস্যময়ী আমার ছোট বোন চপলার মুখখানি! সারা জগতের সকল কিশোরী তো ওরই মত উদ্দাম দুর্ব্বার! গোলাপকে তাদের মাঝে কেমন করে কল্পনা করা যায়।

পণ্ডিত মশায় বলে যেতে লাগলেন—

জানি না পূর্ব্ব জন্মের কোন্ দুষ্কৃতির ফলে গোলাপের মত সুন্দরী মেয়েকে এত অল্প বয়সে এত বড় দুর্ভোগ সহ্য কোরতে হল, তার ইহকালের সুখ সাচ্ছন্দ্য চিরতরে নষ্ট হয়ে গেল।

তার চিত্তশুদ্ধি ও মনশ্চাঞ্চল্য নিবারণের জন্য তার ঠাকুর-মা ও তার বাবা সারাক্ষণ তার উপর কঠোর দৃষ্টি রাখতেন। আচারে বিচারে নিষ্ঠায় তার একচুল এদিক ওদিক হবার সম্ভাবনা ছিল না। গোলাপ যেমনই বুদ্ধিমতী, প্রকৃতিও ছিল তার তেমনই গম্ভীরা। তবুও বয়স চাপল্যে যদি কোন দিন সে তার বোন বা ভাজেদের সঙ্গে হাসি তামাসায় যোগ দিত, মা রুক্ষভাবে তাকে ভৎর্সনা করে উঠতেন আর ঠাকু-মার গালাগালির আর সীমা থাকত না। ইহকাল যার নষ্ট হয়েছে, পরকালের কাজে মন দেওয়া ছাড়া তার যে আর কোন কর্ত্তব্য নেই এ কথা শুনতে শুনতে গোলাপ হাঁফিয়ে উঠতো। সব চেয়ে যাদের সঙ্গে প্রীতি ভালবাসার সম্বন্ধ সময় বিশেষে তারাই যেন সব চেয়ে বেশী ব্যথা দেয়।

তারপর আমার আসবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা গোলাপ এসে ম্লান মুখে বল্লে, তুমি নাকি ভোরে চলে যাবে? আরো যেন কি বলতে চেয়েছিল কিন্তু কিছু না বলে সে নিঃশব্দে চলে গেল।

ফিরে এলুম। গোলাপের কথা অহরহ মনে জাগতে লাগলো, পড়া শুনায় কেমন যেন মন বসাতে পারতুম না।

গ্রীষ্মের ছুটিতে শ্বশুরের নিমন্ত্রণে বাবার অনুমতি নিয়ে আবার সেখানে গিয়ে উঠলুম। এবার গিয়ে দেখি গোলাপ যেন আগের চেয়েও আরো সুন্দরী হয়েছে। পূর্ব্বেকার সঙ্কোচ কাটিয়ে এবার সে বেশ পরিচিতের মতই আমার সঙ্গে হেসে গল্প কোরত। তারপর এমনি হয়ে গেল কমলা, যে, যেদিন সে আমার সঙ্গে আধ ঘণ্টাও আলাদা গল্প না কোরত সেদিন মন নিতান্ত বিরক্ত হয়ে উঠতো—অকারণে তোমার পণ্ডিত-মা'র সঙ্গে ঝগড়া বেধে যেত। আবার যেদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বিলম্বে বাড়ী ফিরতুম এবং সেই কারণে গানের সভা বন্ধ হত, আমাব উপর তার অভিমানের সীমা থাকত না, সে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিত। প্রতি দিনেব এমনি সব তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমাদের পবস্পরের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে লাগল। মনের এই টান নিজেদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেরী হল না।

আমাদের এই মনোভাব সকলের আগেই তোমার পণ্ডিত-মা ধরে ফেল্লে। মেয়েদের এ সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্য রকম তীক্ষ্ণ বোধ সর্ব্বত্রই দেখা যায়, নয় কমলা? তিনি হেসে আমার দিকে চাইলেন।

তারপর গোলাপ হঠাৎ একদিনআর একবারও আমার কাছে এলো না। সুকণ্ঠ ছিলুম, সন্ধ্যাবেলা যে গানের আসর বসতো তাতে প্রতিদিনের মত সকলেই এলো, গোলাপকে ডেকে পাঠালুম, সে কাজের অছিলায় দূরেই রইলো।

রাত্রেই তার না-আসার কারণ জানতে পারলুম। আমার মত যুবাপুরুষের সঙ্গে গোলাপের মত মেয়ের এতটা ঘনিষ্ঠতা নিতান্তই দূষ্য, এ জন্যে তাকেই সব চেয়ে দোষী সাব্যস্ত করে নিতান্ত রূঢ় ও গ্রাম্যভাষায় ঠাকুর-মা যে আজ তার কিরূপ ভীষণ লাঞ্ছনা করেছেন তোমার পণ্ডিত-মা'র কাছেই তার সবিস্তার বর্ণনা শুনলুম।

নিজের উপর ভারি লজ্জা হল। আমার জন্যে তার এই লাঞ্ছনা! মনে করলুম এখানে আর একদিনও থাকা নয়।

কিন্তু যাবার আগে তার সঙ্গে একবার শেষ সাক্ষাৎ করে ক্ষমা চেয়ে যাবো।

চারদিনের মধ্যে এক বাড়ীতে থেকেও সে একবারও আমার ধারে আসে নি। তার সঙ্গে পথে হঠাৎ এক আধবার দেখা হয়ে যেত। দেখলুম, সে আবার আগের মতই শুকিয়ে উঠেছে। ভয় ত্রস্তভাবে আমার দিকে একবার চেয়েই ব্যাধভীতা হরিনীর মতই সে পালিয়ে যেত। তার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগের যতই অসম্ভাব হচ্ছিল—রাগে দুঃখে বিরক্তিতে ততই আমার মন ভরে উঠছিল।

সেদিন দুপুরে গরম পড়েছিল একেবারে অসহ্য। যে যার ঘরে দুয়ার দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। শ্বশুর সকালেই গ্রামান্তরে গিয়েছিলেন। আমার ঘরে আমি একাই ছিলুম। স্ত্রী যথারীতি পাশের বাড়ী গিয়েছিল তাস খেলতে। ঠাকুর-মা'কে রামায়ণ শোনান বন্ধ থাকায় গোলাপ তার ঘরেই ছিল। তার সঙ্গে কথা বলবার এ সুযোগটা আর নষ্ট কোরতে পারলুম না।

ভবিষ্যতের কোন চিন্তা না করেই আমি তার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম। জানলার ধারে বসে সে শুব্ধ ভাবে নীচে পুকুরের দিকে চেয়ে ছিল। ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে ডাকলুম, গোলাপ! ভয়ে বিস্ময়ে সে তাড়াতাড়ি জানলা থেকে নেমে দাঁড়াতেই আমি বল্লুম, কাল সকালেই আমি চলে যাবো, তাই তোমার সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছি।

তার মুখ চোখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমি আরো কিছু বলবার আগেই সে অস্ফুট কণ্ঠে আমায় বল্লে, তুমি এ ঘর থেকে চলে যাও—এখুনি কে দেখে ফেলবে।...

কেউ যে কোথাও নেই—এ আশ্বাসেও তার শঙ্কার অবসান হল না—ভয়ে ও দুঃখে তার চোখ ছাপিয়ে জল এলো।...

তার কাছেই শুনলুম, আমার স্ত্রী বাড়ীতে বলেছে, গানের আসরে আমি গোলাপকে উদ্দেশ করেই গান করি—এবং সেও আমার জন্যেই চুল আঁচড়ায়, সাজগোজ করে—এই সব বলতে বলতে সে আবার কাঁদতে লাগলো।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছিল জানি না—আমার স্ত্রী এসে দরজায় দাঁড়াতেই আমাদের চমক ভেঙে গেল। গোলাপ ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলো, ওমা, আমার কি হবে?

তার চেয়ে বয়সে, বিদ্যায় বড় হয়েও কি যে হবে তা তাকে বলে উঠতে পারলুম না।

পণ্ডিত মশায় থেমে গেলেন। কয়েক মিনিট কেটে গেল। তাকে নীরব দেখে আগ্রহভরে জিগেস করলুম, তারপর পণ্ডিত মশায়?

তারপর পণ্ডিত মশায় মৃদু ও বিষণ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগলেন—

সন্ধ্যার সময় গোলাপের উপর যে নির্য্যাতন সুরু হল কমলা, সে কথা ভাবতেও আজ আমার নিজের উপর ধিক্কার জাগে। ঘরে বসে বসে সবই দেখলুম—শুনলুম—কিন্তু সে লাঞ্ছনা থেকে তাকে সেদিন বাঁচাতে পারলুম না—অথচ আমারই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে তাকে এ দারুণ অপমান ও নির্য্যাতন সহ্য কোরতে হল।

সবশেষে শ্বশুর একখানা কাঁচি এনে গোলাপের ভ্রমর কৃষ্ণ অলোকগুচ্ছ একে একে কেটে দিলেন।

তারপর সাতটি বছর তোমার পণ্ডিত-মা'র সঙ্গে আমি আর বাক্যালাপ করি নি কমলা। গোলাপের এত নির্য্যাতনের মূল তো সে-ই। আশ্চর্য্য এই—ঈর্ষাপরায়ণা সেই বালিকার কথা সকলেই বিশ্বাস কোরলে। আমাদের ব্যবহারের তাৎপর্য্য কেউ বুঝতে চাইলে না—উল্টে আমাদের চরিত্রের উপর দারুণ সন্দেহ কোরলে। তাদের এই আচরণে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলুম, এবং সেই লজ্জায় ও অভিমানে আর কখনো সে বাড়ীতে যাবার ইচ্ছে ছিল না—আর একবারের বেশি যাইও নি।

কথাটা আমাদের বাড়ীতেও সকলের কর্ণগোচর হয়েছিল—এবং তা নিয়ে অনেকের কাছে বহু শ্লেষ বিদ্রূপও আমায় সহ্য কোরতে হয়েছে—কিন্তু আমি কারু কাছে মুখ ফুটে কিছু বলিনি—তারা আমার মনোভাবের কি বুঝবে? আজ তোমার কাছেই বলছি কমলা—বুদ্ধিমতী তুমি—সব বুঝতে পারবে। নব পরিণীত হলেও গোলাপের রূপ লাবণ্য ও সুন্দর ব্যবহারে আমি নিতান্ত মুগ্ধ হয়েছিলুম—কিন্তু তা বলে তো আমার আবাল্যের সংস্কার লোপ পায় নি। হিন্দু

সন্তান হয়ে বিধবার সহিত অন্যায় আচরণ করা কি আমার পক্ষে সম্ভব? গোলাপের সে অবস্থায় আমার যে মমতা জন্মেছিল—আজও তা সমানই আছে—কই দুষ্য তো কিছু ঘটে নি। আর গোলাপ! হিন্দু ঘরের বালবিধবা সে! স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে সে কি ভজনা কোরতে পারে? তবে হ্যাঁ—স্বামী কি বস্তু সে কখনো জানে নি—এবং বাড়ীর কারুর কাছে মিষ্ট ব্যবহারও পায় নি—তাই হয় ত আমার কাছে মমতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে আমার উপর আকৃষ্ট হয়েছিল —এতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সে কথা কে বোঝে?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে এই কথা বলে পণ্ডিত মশায় রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন।

পণ্ডিত মশায়ের কথা শুনতে শুনতে আমারও কেমন যেন গোলাপের উপর একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল—তাই জিগেস করলুম, তাঁর সঙ্গে আর আপনার দেখা হয় নি পণ্ডিত মশায়?

পথের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনি গম্ভীর স্বরে বল্লেন, হ্যাঁ একবার দেখা হয়েছিল—কাশীতে। মিথ্যা কুৎসার স্রোত রোধ কোরতে তাকে গাঁ থেকে সরিয়ে কাশীতে রাখা হয়েছিল।

জান কমলা, শুধু তারই অনুরোধে আমি বহুদিন পরে একবার মাত্র শ্বশুরালয়ে গিয়ে তোমার পণ্ডিতমাকে ঘরে এনেছিলুম।

এমন ভাবে গল্প সুরু করে—শেষ করবার তাঁর অনাগ্রহ, যেন ভারি অদ্ভুত ঠেকছিল—আবার জিগেস করলুম, আপনি আর কি কখনো যান নি?

না কমলা, তবে শীঘ্রই একবার যেতে হবে বোধ হয়।

কেন পণ্ডিত মশায়?

তিনি একটু চুপ করে থেকে বিষণ্ণ কণ্ঠে বল্লেন, গোলাপ একবার আমায় ডেকেছে—বাকি কথাটা শোনবার জন্যে আগ্রহভরে তাঁর মুখের দিকে চাইলুম।

তিনি বল্লেন, আজ তোমার এখানে আসবার আগেই পথে একটি আপনার লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল—কাশী থেকে সে সম্প্রতি ফিরেছে। তার কাছেই শুনলুম—গোলাপের নাকি বড় অসুখ—তাকে একবার শেষ দেখবার জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হয়েছে—পণ্ডিত মশায় চুপ কোরলেন।

বৃদ্ধা গোলাপের তরুণ জীবনের ব্যথার কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল কাশীর কোন্ সরু গলির একখানি জীর্ণ ঘরে মুণ্ডিত মস্তক গৈরিক ধারিণী এক বৃদ্ধা সাগ্রহে কার যেন আগমন প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছে—

জীবন প্রভাতে একদিন যে দুটি মন এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধে বাঁধা পড়েছিল, বিপরীত গতি সে দুটি মনের কাছে সে বন্ধন-স্মৃতি জীবনসায়াহ্নে আজও অম্লান।

ঘড়িতে টং টং করে কটা বাজলো—চমকে উঠে পণ্ডিত মশায় যেন ভয়ানক বিব্রত হয়ে গেলেন। বারে বারে বলতে লাগলেন, তোমার পড়া হোল না, কমলা, তোমার পড়া হল না, সময় নষ্ট হল—কাল আবার আসব—খুব সকাল করে আসবো। মনে হল এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমার কাছে এত কথা বলে ফেলে তাঁর যেন লজ্জা হয়েছে।

বল্লেন, কিছু মনে কোর না কমলা—বুড়ো মানুষ—হয় ত অনেক অবজেকসানেবল কথাই বলে গেলুম।

চিরাভ্যস্ত তাঁর সরল হাসিটি হেসে পণ্ডিত মশায় তাড়াতাড়ি জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন।
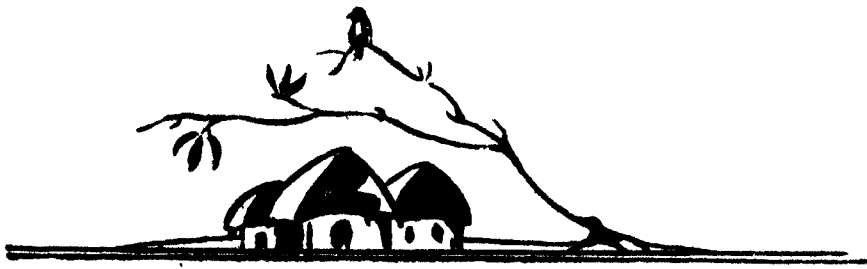
দশ বৎসর পরে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

—এক—

বৈরাগীর বেহালা বেজে উঠল—মধুর, কিন্তু করুণ !

কেন জানি না, আমাদের সমস্ত দেশীসুরই আমার কাছে কেমন করুণ ব'লে মনে হয় !

সব-চেয়ে সুখের গান কি সব-চেয়ে দুঃখের গান? নইলে বসন্ত, ভৈরবী ও সাহানার মত সুখের রাগিণীতেও কেমন-একটা অশ্রুর ইঙ্গিত জেগে ওঠে কেন ?

কিন্তু এই বৈরাগীর বেহালা ! মনে হচ্ছে এ যেন কারুর হাতে বাজছে না, এ যেন কোন তুচ্ছ যন্ত্র নয়, এ যেন একটা জ্যান্ত আত্মার আর্ত্তনাদ !

ঘরে ব'সে শুনি, আর চোখের সামনে জেগে ওঠে একটা শরীরিণী যন্ত্রণা—একটা মূর্ত্ত, তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ! . . .

বৈরাগীর বেহালা রোজ বাজে—মধুর, কিন্তু করুণ !

কোনদিন কানাড়ায়, কোনদিন মুলতানে, কোনদিন ছায়ানটে !—

—মধুর, কিন্তু করুণ !

—দুই—

বাড়ীর সামনে আমারই খানিকটা জমির উপরে ছিল একটা বস্তী।

দু-সারি ঘরের পর ঘর—মাঝখানে একফালি লম্বা উঠান। বাইরের রাস্তার দিকেও সরু রোয়াকের উপরে কতকগুলো ঘর। বৈরাগী থাকৃত তারই একখানাতে।

দোতালায়ও অনেকগুলো ঘর—মাথায় তাদের করোগেটের আবরণ, এবড়োখেবড়ো গায়ে তাদের মাটির প্রলেপ, সামনে তাদের টানা বারান্দা !

বস্তী আর আমার বাড়ীর মাঝখানে একটা শীর্ণ গলি—তার খোয়া-বার-করা গা দেখলে মনে হয়, গলির সর্ব্বাঙ্গে যেন ফোড়া জন্মেছে !

বস্তীর মধ্যে বাস করত ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সব-জাতের খুচ্‌রো নমুনা : দাবানল যেমন বাঘ আর হরিণের মধ্যে হিংসার সম্পর্ক লুপ্ত ক'রে দেয়, দারিদ্র্যও তেমনি উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলনের বার্ত্তা আনে। এখানে

সংস্কারকের বক্তৃতার অপেক্ষায় কেউ ব'সে থাকে না।

আমার ঘরের ভিতর হ'তে বস্তী থেকে নিত্য-নব নাট্যাভিনয়ের বিচিত্র সাড়া আসে। এবং সে অভিনয়ের মধ্যে নব রসের কোনটারই অভাব থাকে না।

কত রকম নালিসই যে শুনতে হয়! সে-সব অভিযোগ যেমন অদ্ভুত, তাদের মীমাংসাও তেমনি কঠিন। কিন্তু উপায় নেই, বস্তীর জমিদারকে ও-রকম ঝঞ্চাট পোয়াতেই হবে।

এই বস্তীর ভিতর থেকেই বেহালার সুর একদিন কাণে এসে বাজ্‌ল।

দু-তিন দিন বেহালার আওয়াজ শুনেই বুঝলুম এ বাজ্‌না ওস্তাদের হাতের।

যে-সরকারের উপরে বস্তীর ভার ছিল তাকে ডেকে সুধলুম, "ওখানে রোজ বেহালা বাজায় কে?"

—"রাস্তার ধারে, একতালার ঘরে কে একটা বৈরাগী ভাড়াটে এসেচে। সেইই বাজায়।"

লোকটাকে দেখবার জন্যে কেমন কৌতূহল হ'ল। সরকারকে বললুম, "তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও তো!"

খানিক পরেই বৈরাগী আমার বৈঠকখানার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

জরাজীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, কোমর এত ভেঙে গেছে যে, লাঠির উপরে ভর্‌ না দিয়ে দাঁড়ালে বোধহয় তার দেহখানা দুমড়ে মাথা আর পা এক হয়ে যেত।

—ঠিক একটা জ্যান্ত মড়া!

একমুখ সাদা দাড়ী-গোঁফ, একমাথা সাদা ঝাঁক্‌ড়া-ঝাঁকড়া রুখু চুল, তারই মাঝে কালো-জামের মত কালোপানা মুখের খানিক-খানিক, ভুরু-ওঠা কপালের ছায়ায় দুটো অত্যন্ত-ঘুমন্ত কোটর-ঢোকা চোখ দেখা যাচ্ছে।

বুড়ো মাথা ও চোখ তুলে ধুঁকতে ধুঁকতে আমার মুখের পানে তাকালে,—সে চোখের দৃষ্টি দেখলে মনে হয়, দীর্ঘকাল জেগে জেগে তারা যেন আজ বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

ডেকে বললুম, "ঘরের ভেতরে এস।"

বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল।

—"তোমার নাম কি?"

—"আজ্ঞে, তিতুরাম দাস।"

—"কি কর?"

—"আজ্ঞে, বৈরাগী-মানুষ, করব আর কি হুজুর, দোরে দোরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াই।"

—"চিরদিনই এম্‌নি ভিক্ষে ক'রে আসচ?"

—"না হুজুর, আগে যাত্রার দলে ছিলুম। বেয়ালা বাজাতুম।"

—"তুমি বেশ বাজাও। তোমার বেহালাখানা একবার নিয়ে এস, আমি তোমার বাজ্‌না শুনতে চাই।"

তিতুরাম লাঠি ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে চ'লে গেল এবং অল্পক্ষণ পরে তার বেহালাখানা নিয়ে আবার ফিরে এল। তারপর কার্পেটের উপরে ব'সে বেহালার কাণে দু-চারটে মোচড় দিয়ে এবং তাঁতের উপরে দু-চারবার ছড়ী টেনে জিজ্ঞাসা করলে, "কি বাজাব, হুকুম করুন।"

—"তোমার যা খুসি বাজাও।"

তিতুরাম একে একে অনেকগুলি রাগিণী বাজালে। চমৎকার মিঠে হাতে সুরের খেলায় সে আমার মন ভরিয়ে দিলে বটে, কিন্তু একটা জিনিষের যেন অভাববোধ করতে লাগলুম। একলা ঘরে ব'সে তিতুরাম যখন বেহালা বাজায়, তখন একটা গোপন কান্নার যে মূর্চ্ছনা শুনি, আজ্‌কের এ ফরমাজী বাজ্‌না সে কান্নাকে যেন হারিয়ে ফেলেছে। . .

আর্টের মধ্যে দুঃখ আর কান্না কি উপভোগ্য নয়?

বাজ্‌না শেষ হ'লে তিতুরামকে কিছু বখ্‌সিস দিয়ে বললুম, "তোমার দেশ কোথায়?"

—"বাগ্‌নাপাড়ায় বাবু!"

—"সেখানে তোমার কে আছে?"

তিতুরামের ঘুমন্ত চোখদুটো হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মত জেগে উঠেই আবার ঝিমিয়ে পড়ল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে তিক্তস্বরে সে বল্‌লে, "দেশে আমার কেউ নেই বাবু!"—ব'লেই আমাকে নমস্কার ক'রে লাঠি ঠক্‌ ঠক্‌ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—তিন—

তারপর তিতুরাম প্রায়ই আমার কাছে আসে এবং আমাকে বেহালা শুনিয়ে বখ্‌সিস্‌ নিয়ে যায়।

কিন্তু নিঝুম রাতে নিজের ঘরে ব'সে আপন মনে বেহালার গানের সঙ্গে সে তার প্রাণের কান্নাকে যখন মিলিয়ে দেয়, তার বাজ্না তখনি আমার বেশী ভালো লাগে।

তাকে আমি বথ্সিস্ দি এই রাত্রের বাজ্নাই স্মরণ ক'রে!

তার ফরমাজী বাজানো সে ভালো হয় না, এতে আমি আরো-বেশী কালোয়াতির পরিচয় পাই। এই তো শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ!

যে আর্ট হুকুমের চাকর, তার সাহায্যে উদরকে অন্নে ভরাট্ এবং দেহকে বস্ত্রাদিতে সজ্জিত করা যায়, কিন্তু কলা-লক্ষ্মীর লজ্জিত মুখকে প্রসন্ন ক'রে তোলা যায় না।

...আজ ক'দিন তিতুরামের বেহালা একেবারে চুপচাপ।

তিতুরামের হ'ল কি? বেহালার সঙ্গে প্রাণ মিশিয়ে কাঁদতে আর কি তার ভালো লাগে না?

সেদিন সকালে উঠে খোঁজ নিয়ে শুনলুম, তিতুরামের বড় অসুখ।

বুড়োকে ভালো লেগেছিল। তার অসুখ শুনে মনটা খুৎ খুৎ করতে লাগল। আহা, একলা মানুষ, দেখবার শোনবার কেউ নেই!

গেলুম তার ঘরের ভিতরে। একরাশ ছেঁড়াখোড়া স্তাকড়া-চোকড়ার ভিতরে চামড়া-ঢাকা অস্থিস্তূপের মত তিতুরাম কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে আছে।

আমাকে দেখে সসম্ভ্রমে সে উঠে বসবার যোগাড় করলে। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, "না, না, উঠতে হবে না, তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো। তোমার অসুখ শুনে দেখতে এসেছি।"

কৃতজ্ঞতায় তিতুরামের দুই চোখে জল ভ'রে উঠল।

হাত দিয়ে দেখলুম তার কপাল যেন পুড়ে যাচ্ছে! তখনি চিকিৎসার ব্যবস্থা না ক'রে থাকতে পারলুম না।

হপ্তাখানেক পরে তিতুরামের অসুখ সারল। আমাকে দেখে ক্ষীণ স্বরে বললে, "আর জন্মে আপনি আমার কে ছিলেন বাবু!... আমি একটা ঘাটের মড়া, আমাকে খুন করলেও হয়তো লোকের ফাঁসি হয় না। আমার ওপরে এত দরদ!"

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে আমি বললুম, "তিতু-রাম, একলা থাকার কত বিপদ, দেখ্চ তো? দেশ ছাড়া আর কোথাও কি তোমার আপনার লোক কেউ নেই?"

ঘরের ছাদের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে সে বললে, "না।"

—"সবাই মারা গেছে?"

তিতুরামের ঘুমন্ত চোখে আবার যেন বিদ্যুতের রেখা দেখলুম। অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে খুব আস্তে আস্তে বললে, "বাবু, আপনি যে আমাকে ভালোবাসেন তা আমি বুঝতে পারচি। আপনি যখন এত ক'রে জিজ্ঞেস করচেন তখন আর লুকোতে পারব না।" . . . . . . তৈলাক্ত ময়লা বালিসটার উপরে হেলে প'ড়ে প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় থেমে থেমে সে বললে, "একজনকে আপনার করতে চেয়ে-ছিলুম বাবু! কিন্তু সে আপনার হয় নি . . . সে আজ বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না!

—"কে সে তিতুরাম?"

—"আমার স্ত্রী।"

—"তোমার স্ত্রী?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাকে আমি ভালোবাসতুম, এখনো ভালোবাসি। কিন্তু সে আমার হয় নি,—আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে।"

আমি কিছু বললুম না।

তিতুরাম বলতে লাগল, "তার কোন দোষ নেই বাবু, সব দোষ আমারি। বুড়োবয়সে কেন আমি বিয়ে করতে গেলুম? তাকে যখন বিয়ে করি, তখন আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ, আর সে দশ বছরের মেয়ে! তার কি আমাকে ভালো লাগবার কথা? ... আমার কাছে সে পাঁচ বছর ছিল। এই পাঁচ বছর তাকে আপনার করবার অনেক চেষ্টা করেচি। সে যা চেয়েচে তাই দিয়েচি—তাকে আমি পুজো করেচি। কিন্তু সে আমার হয় নি। মুখের ওপরে আমাকে সে ঘাটের মড়া ব'লে ডাকত। তাও আমার ভালো লাগত। সে যে আমার কাছে আছে, এই ভেবেই আমি সুখী ছিলুম। সে যে আমার কাছে থাকবে না, এ কথা কখনো ভাবতেও

পারি নি ! . . . . কিন্তু একদিন ভিন্ গাঁ থেকে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এসে দেখি, আমার ঘরে বাতি দেবার কেউ নেই। সে অন্ধকার ঘরের কথা জীবনে আর ভুলতে পারব না ! . . . যাত্রার দলে ক্ষেত্তর ব'লে একটা ছোঁড়া গান গাইত, তারই সঙ্গে সে চ'লে গিয়েছিল। তারপর দশ বছর কেটে গেছে। যাত্রার দলে আর মন বস্‌ল না—দেশে দেশে পথে পথে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি! তাকে আমি তখনো ভালোবাসতুম, এখনো ভালোবাসি। আর একবার তাকে দেখতে সাধ হয়, সে সুখে আছে জান্‌লে আমিও সুখে মরতে পারি ! . . কিন্তু আর কি তার দেখা পাব ?" . . . .

তিতুরাম চুপ করলে। কিন্তু তার চোখ দেখে আমার মনে হ'ল, অশ্রু-যবনিকা ভেদ ক'রে তার দৃষ্টি যেন সুদীর্ঘ দশ বৎসরের ওপারে গিয়ে সেই ঘরখানাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে-ঘরে এক সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালবার লোকের অভাব হয়েছিল ! . . .

তার সেই স্মৃতিকাতর দৃষ্টি বর্ত্তমানের ভিতরে ফিরে আসবার আগেই আমি ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

আজ বেশ বোঝা গেল, তিতুরামের বেহালা নিশীথ রাতে কেন অমন ক'রে কাঁদে।

শিল্পীর প্রাণ নিয়েই যে শিল্পীর গান !

—চার—

কিছুদিন যায়।

মাসিকপত্রে আমার একখানা ধারাবাহিক উপন্যাস বেরুচ্ছে, আজই তার কয়েকটা পরিচ্ছেদ লিখে না ফেললেই নয়।

কারণ সম্পাদক কড়া হুকুম পাঠিয়েছেন, আসছে কাল তাঁকে 'কপি' না পাঠালে যথাসময়ে তাঁর পক্ষে কাগজ প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

কিন্তু সম্পাদক তো জানেন না যে, আইনত আমি তাঁর হুকুম মানতে বাধ্য হ'লেও আমার মন 'পেনাল কোডে'র কোন মানাই মানতে রাজি নয় !

বিদ্রোহী আমার মন !

সে চঞ্চল এখন কোন্ আকাশের কোন্ ইন্দ্রধনু-তোরণে গিয়ে স্বপ্ন-নটীর নূপুরের ছন্দ শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে—

আর আমার হাতের কলম থেকে কালির সরসতা ক্রমেই শুকিয়ে আসছে !

—এমন সময়ে তিতুরামের আবির্ভাব ! সমস্ত মূর্ত্তিখানা তার অসহ ব্যগ্রতায় ভরা, ঘুমন্ত চোখদুটো তার জাগরণের পুলকে জল্-জল করা !

হাতের কলম টেবিলে রেখে ফিরে ব'সে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি তিতুরাম, খবর কি ?"

—"সে এসেচে বাবু, সে এসেচে !"

—"কে এসেচে ?"

—"ক্ষীরোদা !"

—"ক্ষীরোদা ? কে ক্ষীরোদা ?"

—"আমার স্ত্রী, বাবু, আমার স্ত্রী ! আবার তার দেখা পেয়েচি !"

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আমি বললুম, "তোমার স্ত্রী ? কোথায় তার দেখা পেলে ?"

—"ঠিক আমার ওপরকার ঘর তারা ভাড়া নিয়েচে !"

—"বল কি ! এ তো বড় আশ্চর্য্য কথা !"

—"আমি নিজের চোখে দেখেচি বাবু, আমার চোখ কি তাকে ভুলতে পারে ? আজ তার বয়স পঁচিশ বছর, কিন্তু তার মুখ এখনো ঠিক তেম্‌নি কচি আছে—হ্যাঁ, তেম্‌নি কচি তেম্‌নি সোন্দর !"

—"তুমি কি তার সঙ্গে কথা কয়েচ ?"

—"না বাবু, তার সঙ্গে আর একটা লোক রয়েচে !"

—"সেই ক্ষেত্র নাকি ?"

—"না, ক্ষেত্তর নয়, আর একটা অচেনা লোক। শুনলুম জোড়াসাঁকোর বাল্প-পটিতে সে কাজ করে।"

—"তাহ'লে তোমার ক্ষীরোদা আবার হাত-বদ্‌লি হয়েচে ?"

—"সে-সব আমি জানি না বাবু, আমি খালি এই জানি যে আমার প্রাণের টানে ক্ষীরোদা আবার ফিরে এসেচে"—বলতে বলতে লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে তিতু-রাম আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উৎসাহের আবেগে

আজ তার দুমড়ে-পড়া দেহও যেন অনেকটা সোজা হয়ে উঠেছে!

সম্পাদকের কড়া হুকুম মন থেকে বেমালুম মুছে গেল! সারা সকালটা ক্ষীরোদার কথায় পূর্ণ হয়ে দুপুরের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

সম্পাদকের কাগজ যদি নিয়মিত সময়ে না বেরোয় তবে তার জন্তে দায়ী হবে ঐ ক্ষীরোদা! সে দেখা দিয়ে তিতুরামকে মজিয়েছে এবং না দেখা দিয়েই আমাকে মজালে দেখ্‌ছি!

—পাঁচ—

রাত ঢের।

উদার ও মহৎ ভাবে ভরা একটা বৃহৎ কবিতা লিখে ব'সে ব'সে ভাবছিলুম, পাঠক-মহলে এ লেখাটা কতখানি উত্তেজনার সৃষ্টি করবে!

মাসিকপত্রে আজকাল এই-সব কবিতাই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ-রকম কবিতা রচনার একটা মস্ত সুবিধা হচ্ছে এই যে, এতে কবিত্বের দরকার নেই। দেশে বড় বড় ভাব আছে অঢেল এবং অভিধানে বড় বড় কথা আছে অগুণ্‌তি, সেগুলি সংগ্রহ কর, নানা আকারে সাজিয়ে দাও, একটা জম্‌কালো শিরোনামা দিয়ে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দাও—ব্যস্‌, কবি-নাম ক্রয় করতে তোমার কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না!

জ্যোৎস্নার একটিমাত্র কিরণ রেখায়, ঝরা শেফালার একখানি পাপ্‌ড়িতে, তৃণ-মঞ্জরীর এতটুকু দুলন্ত ছায়ায় কবিত্বের যে অসীম মাধুরী লুকিয়ে থাকে, ক-জনের চোখ তাদের ধরতে পারে? ....

নিরালা রাতের নিঝুম বুকের উপরে, কোন্ অদেখা রূপসীর দীর্ঘশ্বাসের মত, আচম্বিতে তিতুরামের বেহালার সুর জেগে উঠ্‌ল!

জান্‌লার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। পূর্ণিমার রূপটানে আকাশের অগাধ নীলিমা যেন রূপোলী হয়ে এসেছে,— চাঁদের মুখে যেন পরিতৃপ্ত প্রেমের আনন্দ ফুটে উঠেছে।

বেহালায় বাজছে সেই পুরোণো সুর,—মধুর, অথচ করুণ। রাগিণী যেন আজ স্মৃতির সাগরে ডুব দিয়েছে, কতদিন-আগে-ঝরা অশ্রুমুক্তাগুলি একে একে ফের কুড়িয়ে আনবার জন্যে!

বিরহী গান যেন কেঁদে কেঁদে বলছে—দাও দাও, অতীতের প্রাণকে আমার ফিরিয়ে দাও, আবার ফিরিয়ে দাও, আবার ফিরিয়ে দাও গো ফিরিয়ে দাও, দাও! ......

এমন বাজ্‌না তো তিতুরাম আর কোনদিন বাজায় নি!

নীচের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, তিতুরামের ঘরের উপরকার বারান্দায় কার এক শ্বেতবসন মূর্ত্তি,—মূর্ত্তির মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

বেহালা বাজছে—জীবন্ত প্রাণোচ্ছ্বাসের মত, হৃদয়-তন্ত্রীর ঝঙ্কারের মত, নির্ব্বাসিত বাসনার অশ্রুরুদ্ধ ক্রন্দনের মত!

—সেই সঙ্গে তার মূর্চ্ছনার ছন্দে আমি যেন নিশির ডাকের প্রতিধ্বনি শুনলুম! ....

শ্বেতবসন মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল। বারান্দার কোণের সিঁড়ি দিয়ে নীচে—রাস্তার দিকে নামতে লাগল। পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে তখন ভালো ক'রে দেখতে পেলুম— সে মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের!

রাস্তায় নেমে নারী-মূর্ত্তি সমান এগিয়ে চলল, তিতুরামের ঘরের দিকে। .... সেও কি নিশির ডাকের প্রতিধ্বনি শুনেছে?

নারী-মূর্ত্তি তিতুরামের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল— সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল বেহালার করুণ কাকুতি। ....

—ছয়—

সকাল বেলায় জেগে উঠেই শুনলুম, বস্তীর ভিতরে বিষম গোলযোগ হচ্ছে।

ব্যাপার কি জানবার জন্যে সরকারকে সেখানে পাঠিয়ে দিলুম।

সে ফিরে এসে বললে, "দোতালায় যে নতুন ভাড়াটে এসেচে সে ভারি কান্নাকাটি করচে।"

—"কেন?"

—"তিতুরাম নাকি তার মেয়েমানুষকে নিয়ে পালিয়েচে।"

—"তিতুরাম!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। রামভরণ সিং আজ কি কাজে

হাওড়ায় গিয়েছিল, সে স্বচক্ষে দেখে এসেচে যে, তিতুরাম সেই মেয়েমানুষটার সঙ্গে রেলগাড়ীতে উঠচে।"

—"স্ত্রীলোকটার নাম জানো?"

—"আজ্ঞে, তার নাম শুনলুম ক্ষীরোদা।"

—"তিতুরামের খোঁজ করেচ?"

—"তার ঘর খালি প'ড়ে আছে।"

দশ বৎসর আগে ক্ষীরোদা 'ঘাটের মড়া' তিতুরামকে ত্যাগ ক'রে এসেছিল যৌবনকে উপভোগ করতে।

দশ বৎসর পরে শোক দুঃখ বয়সের ভারে তিতুরাম এখন প্রায় সত্যিকার মৃতদেহে পরিণত হয়েছে। পূর্ণযৌবনা ক্ষীরোদা আজ কিসের প্রলোভনে আবার তার সঙ্গে ফিরে গেল?

দশ বৎসর আগে তিতুরামের ভিতরে ক্ষীরোদা এমন কি দুর্লভ জিনিষ দেখেছিল, আজ যাকে সে যৌবনের আনন্দ-বিলাস ছেড়ে সাদরে গ্রহণ করলে?

—অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম . . . .

লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠা

শ্রীহরিপদ গুহ

যুবরাজ আদিত্যশেখর সখা নাগকেশরকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

নানা স্থান ঘুরতে-ঘুরতে একদিন তাঁরা একটা ক্ষুদ্র গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যা হয় দেখে এবং কোন উপায় স্থির করতে না পেরে দুজনে এক কৃষকের কুটীরে গিয়ে সে রাত্রের জন্য একটু আশ্রয়-ভিক্ষা চাইলেন।

কৃষক অভ্যর্থনা জানিয়ে মহা-সমাদরে তাঁদের গৃহে স্থান দিলে। তার পত্নী ছিল না; কাজেই কন্যা সুনন্দা পরম-আগ্রহে অতিথিদের সেবা-যত্ন করতে লাগ্‌ল।

রাজপুত্র তার অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হয়ে আপনার চিত্ত হারিয়ে বস্‌লেন। মর্ত্ত্যে কেন, স্বর্গেও বুঝি সেই কুমারীর রূপের তুলনা হয় না!

সমস্ত রাত্রি অন্তর-যুদ্ধে রাজকুমার ক্ষত-বিক্ষত হলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃষক-নন্দিনীকে মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পার্‌লেন না।

পরদিন বিদায়ের পূর্ব্বে আদিত্যশেখর সুনন্দাকে নির্জ্জনে পেয়ে কোন মতে আর নিজেকে সংযত রাখ্‌তে পার্‌লেন না; পরিচয়-দানের সঙ্গে অকস্মাৎ তার হাত ধরে আপনার প্রণয়-বাসনা ব্যক্ত করে ফেল্‌লেন।

কৃষকবালা ধীরে ধীরে রাজপুত্রের হাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চাইলে; কাল-বৈশাখীর মেঘের ছায়া মুহূর্ত্তে তার বদনে প্রতিফলিত হয়ে উঠ্‌ল। সে তীব্র-শ্লেষপূর্ণ-কণ্ঠে বল্‌লে—যুবরাজ বুঝি দরিদ্র অসহায়া কুমারীদের একলা পেয়ে এইরূপ অপমানই করে থাকেন?

আদিত্যশেখর বিস্মিত, স্তম্ভিত! অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে তিনি বল্লেন—তুমি বিপরীত বুঝো না; আমি তোমায় ভালবাসি!

সুনন্দা ব্যঙ্গের হাসি হেসে উত্তর দিলে—আপনাদের ভালবাসা! কি তার মূল্য, কি তার পরিণাম, কতটুকু তার সার্থকতা!

বল কিসে তোমার প্রত্যয় হবে?

সত্য বলে' বিশ্বাস হবে সেই দিন, যেদিন রাজপুত্রের ভালবাসা নির্বিচারে এ দীন কৃষক-কুমারীকে সহধর্ম্মিনী-রূপে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না!

স—হ—ধ—র্ম্মি—নী!

নয় ত কি? উচ্চবর্ণের গৌরব আভিজাত্যের স্পর্দ্ধা কি এতই বড় যুবরাজ, যে, তারা নারী-হৃদয়ের অমূল্য-মণিকে একটা ফাঁকা ভালবাসার নাম দিয়ে ক্রয় করতে চায়?

লজ্জায় রাজপুত্রের মস্তক অবনত হয়ে এল। তিনি অনেকক্ষণ ধরে আপন-মনে কি চিন্তা করলেন; পরে দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন,—তাই হবে! ভগবানের শপথ,—আজ থেকে তুমিই আমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিনী!

সুনন্দা তখন তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে ভক্তি-গদ গদকণ্ঠে বল্লে—যুবরাজের জয় হোক! স্বামী, এ দাসী এখন হতে কায়মনোবাক্যে আপনারই!

কুমার ও সুনন্দার আগমন-সংবাদ রাজপ্রাসাদে এসে পৌছাল। মহিষী, কন্যা ও মহিলাগণকে সঙ্গে নিয়ে বধূ-বরণ করতে পুরদ্বারে এগিয়ে এলেন। ক্রমে বাহকেরা একখানি শিবিকা সেখানে এনে হাজির করলে; আদিত্য-শেখর, নাগকেশরও উপস্থিত হলেন। পুত্র মাতার পদধূলি গ্রহণ করে অকপটে আপনার পত্নীর পরিচয় তাঁকে প্রদান করলেন।

শ্রবণ মাত্রেই জননী ঘৃণায় সন্তানের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন; রাজকুমারী ও পুরস্ত্রীরা অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছিঃ ছিঃ করতে লাগলেন।

রাজা তখন ঘটনাস্থলে আগমন করে রাণীর মুখে সমস্তই অবগত হলেন এবং পুত্রের ধৃষ্টতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্মুখে পেয়ে ক্রোধে একেবারে বাক্‌শূন্য হয়ে গেলেন! কিয়ৎক্ষণ পরে আপনাকে শমিত করে নিয়ে তিনি কৃষক-যুবতীর উদ্দেশে গম্ভীর-কণ্ঠে বল্লেন—তুমি আদিত্যকে ত্যাগ কর; পরিবর্ত্তে তোমায় প্রচুর ধন-রত্ন দান করব।

সুনন্দা দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলে—ধন্য, মহারাজের নিকট খেলার বস্তু হতে পারে, কিন্তু এ দরিদ্রার কাছে তা ধন-রত্ন অপেক্ষাও শতগুণে প্রিয়, অমূল্য!

বিস্মিত নরপতি স্থির দৃষ্টিতে একবার কৃষক-বালার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন; তারপর পুনরায় বলতে লাগলেন—তা ছাড়া, তোমায় এক বিশাল ভূসম্পত্তির অধিশ্বরী করে দেব। স্বীকার কর, যুবরাজের পতি তোমার আর কোন দাবী রইল না?

সুনন্দা নীরবেই দাঁড়িয়ে রইল, উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করলে না।

আমার রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য, সমস্ত, সমস্তই তোমার! বল, আমার পুত্র তোমার কেউ নয়; শুধু একবার—

না রাজা! পৃথিবীর আধিপত্যের বিনিময়েও আমি আমার স্বামী ত্যাগ করব না!

তবে পত্নী হয়ে স্বচক্ষে পতির নিধন দর্শন কর! এই বলে রাজা উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—ঘাতক।

মহিষী ছুটে এসে স্বামীর নিকট নতজানু হয়ে করযোড়ে পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন।

রাজকুমার পিতাকে প্রণাম করে বল্লেন—সত্যই শ্রেয়, প্রাণ তুচ্ছ; আশীর্ব্বাদ করুন নরনাথ, বড়র জন্য যেন ক্ষুদ্রতাকে হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতে পারি!

কৃষকবালা তখন তার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত ছুরিখানা ক্ষিপ্রহস্তে টেনে নিয়ে নৃপতির বুকের উপর স্থাপন করে বল্লে—বাক্য প্রত্যাহার করুন মহারাজ, নতুবা এই ছুরিকা এখনই আপনার বক্ষ বিদ্ধ করবে!

ভূপতি সেই তেজোদ্দীপ্ত মূর্ত্তির দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলেন; পরে উল্লাসে বলে উঠ্‌লেন—চমৎকার! তারপর স্নেহ-পরিপূর্ণ-কণ্ঠে সুনন্দাকে বল্লেন

—আমি পরাজিত! কিন্তু মা অপরাজিতা, কি দিয়ে তোমায় রাজগৃহে বরণ করব?

সুনন্দা ছুরিখানা ফেলে দিয়ে নৃপতিকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে বিনয়নম্রকণ্ঠে উত্তর দিলে—কেন পিতা, আশীর্ব্বাদ?

মুগ্ধ নরপতি হেসে বল্‌লেন—ঠিক্ বলেছ মা! এই বলে তার মাথায় হাত রেখে নীরবে আশীষ জানালেন।

রাণী তখন সাদরে পুত্রবধূর মুখ চুম্বন করে বল্‌লেন—তোমায় চিন্‌তে পারি নি; এস মা লক্ষ্মী, ঘরে এসে রাজভবন আলোকিত কর!

শ্বশ্রূর পাদমূলে সুনন্দা আপনাকে লুটিয়ে দিয়ে ডাক্‌লে—মা!

রাজনন্দিনী সস্নেহে ভ্রাতৃবধূর হাত ধরে তুলে তাকে অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করতে লাগ্‌লেন।

নাগকেশর ঈষৎ হেসে বল্‌লেন—সখা, নূতন করে পত্নী পেলেন; মহারাজ, মহিষী এবং রাজকুমারী বধূর সঙ্গে পরিচিত হলেন; সঙ্গে-সঙ্গে এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের ভাগ্যেও মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে ভগ্নী-লাভ ঘটে গেল!

সুনন্দা হাস্য-রঞ্জিত-মুখে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে বল্লেন,—আমি মানুষকে স্বামীত্বে বরণ করেছিলাম, তাই আমার এ সৌভাগ্য। আপনিও আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন!

আব্‌দার

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আল্‌গোছে আয় সখি,
বো'স্ পাশটায়,—
কেউ নেই দূরে কাছে
দোরে জান্‌লায়।
থাকে যদি তুই কেন
হো'স্ চঞ্চল?
দেহ চায় দেহটারে—
কে না জানে বল্‌!

ঠোঁঠে তোর ভেঙেছে কে
রাঙা কুঙ্কুম
লোভী মন চায় ওরি
গোটা কয় চুম।
ঐ দ্যাখ কত চুমো
ঝরে জ্যোৎস্নায়
তুই শুধু ম'রে যাস্
মিছে লজ্জায়।

চারি ধারে যূথী-যাতি
কুন্দ-অশোক;
নীল সাগরের মায়া—
তোল্ দুটি চোখ্।
মিছে খুঁত্—তোর সখি,
সবি অদ্ভুত!
মেঘে মেঘে চিরদিনই
জাগে বিদ্যুৎ।

বাহুমূলে উচ্ছলে
স্রোত্ তড়িতের—
বুকে বুকে বাজে বীণ্
পাস্ নি কি টের!
তনু-মন অনুখন
চায় তোরে আজ।—
গাঙে যদি বান জাগে—
সে কি তার লাজ!

চলে নাগরী কাঁখে গাগরী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

চ্যারিটেব্‌ল ডিস্‌পেন্সারীর ডাক্তার।

পুরুষকার অপেক্ষা অদৃষ্ট মানি, তাহা না হইলে স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের ব্যবসা শিখিয়া চাকুরী করিতে বিদেশে আসিব কেন?

বয়স অল্প, চিকিৎসা ব্যবসায়ে ইহাও সুলক্ষণ নহে।

পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা ভূয়োদর্শনের মূল্য অধিক স্বীকার করি, কিন্তু মাথার চুল না পাকিলে অভিজ্ঞতা বাড়ে না,—এ কেমন কথা?

সাধারণ মানুষে অত কথা বুঝে না, বুঝিবার প্রয়োজনও তাহাদের নাই।

অতএব, একমাথা ঢেউ খেলান কাঁচা চুল লইয়া যে চিকিৎসক সবেমাত্র কলেজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তার যদি অর্থের প্রয়োজন না থাকে, তবে সে সাধারণের কদাচিৎ অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতে চুল পাকাইয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু অভাবের তাড়না যাহাকে অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত অব্যাহতি দিতে আদৌ সম্মত নহে, চাকুরী গ্রহণ ছাড়া তাহার আর উপায়ান্তর কি?

বেশ আছি।

সকাল ছ'টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত যা একটু কাজের ভিড়, সমাগত রোগীগণকে দেখিতে হয়, তাহার পরেই সমস্ত দিন অনাহত দীর্ঘ অবকাশ। বাহিরের 'ডাক' বড় একটা নাই বলিলেই হয়।

নিরন্ন দরিদ্র গ্রামবাসী—চিররুগ্ন। পথ্যের পয়সাই সংগ্রহ করিতে পারে না, ডাক্তারের দর্শনী তাহারা জোগাইবে কোথা হইতে? ছয়মাসের রোগীও আত্মীয়ের স্কন্ধে ভর করিয়া ডিস্‌পেন্সারীতে আসে ব্যবস্থা লইতে।

দেখিয়া দুঃখ হয়, কিন্তু উপায় কি?

সমস্ত দুপুর পড়িয়া-পড়িয়া ঘুমাই।

বিকাল বেলা আরাম কৌচটা কোয়ার্টারের বারান্দায় পাতিয়া চুপচাপ তাহার উপর পড়িয়া থাকি।

সামনেই বালি মাটির সঙ্কীর্ণ পথ, ছায়াশীতল বটতলার পাশ দিয়া অদূরে পদ্মদীঘির শান-বাঁধান ঘাটে গিয়া মিশিয়াছে।

কলসী কাঁখে পাড়ার মেয়েরা জল আনিতে যায়। চমৎকার তাহাদের চলার ঐ ভঙ্গীটুকু।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া শুধু ইহাই দেখি।

বাতাস কী দুষ্ট!

নিতান্ত বেহায়ার মত মেয়েদের আঁচল, মুখের ঘোমটা পথের মাঝেই চকিতে খসাইয়া উধাও হয়।

কলসীতে জল-তরঙ্গ বাজে—ছলাৎ ছল্, ছলাৎ ছল্।

জল চল্‌কাইয়া কাপড় ভিজিয়া যায়। নবোদ্গত যৌবনের কী পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য!

ঐ সূক্ষ্ম নীলাম্বরী-পরা তরুণী বধূটি—কি সুষ্ঠু সুসংযত ওর ঐ অঙ্গসৌষ্ঠব, কি সুন্দর ওর ঐ লীলায়িত গতিভঙ্গ, হাতের সোনার চুড়িগুলির আওয়াজ কি মিষ্টি!

ঘোমটা-ঢাকা ওর ঐ মুখখানি কিন্তু দেখিনি একদিনও। বড় লজ্জাশীলা।

বাতাস বোধ হয় হার মানিয়াছে!

কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর ঐ যে আবরণটুকু, মনে হয় ঐ টুকু আরও সুন্দর।

শিবরাম আমার কম্পাউণ্ডার। বয়সে বোধ হয় আমার অপেক্ষা দুই এক বৎসরের ছোটই হইবে, সাদাসিদা মানুষটি। হাতে ধরিয়া কাজ শিখাইয়াছি, তাই আমাকে বাবা বলিয়া ডাকে। সরল, নিরীহ, সর্ব্বদাই সকৃতজ্ঞ।

মাঝে মাঝে বলে,—ইক্‌মিক্ কুকারে খেয়ে কি তৃপ্তি হয় বাবা? তার চেয়ে বরং—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলি,—না না, শিবরাম, এতেই আমি বেশ খাই বাবা।

রাঁধুনী খুঁজিয়াছিলাম কিন্তু মিলে নাই।—তাহা বলিয়া পরের বাড়ীতে ঝঞ্ঝাট বাড়াইতে কেমন যেন ইচ্ছা হয় না।

শিবরাম বলে,—হ্যাঁঃ! ওতে নাকি আবার বেশ খাওয়া হয়!—একটা ভাজা নেই, একটা ডাল্‌না নেই—

বলি,—নেই বা থাক্‌লো শিবরাম। ডাল, আলুভাতে আর ঘি,—বাস্,—এই ত হল বাঙ্গালীর খোরাক! তার ওপর আবার দুধও আছে।

শিবরাম বলে,—না বাবা, রোজ এক রকম কি ভাল লাগে?

কথাটা সত্য।

আমি কিন্তু অস্বীকার করি।

এক একদিন শিবরাম আসিয়া বলে,—বাবা, আপনার নেমন্তন্ন। আজ আমার বাড়ীতে পা'র ধুলো দিয়ে আমার জন্যে দু'টি পেরসাদ রেখে আস্‌তে হবে।

শিবরাম আমার স্বজাতি কিন্তু তথাপি তাহার এই অতিরিক্ত বিনয় বাস্তবিকই আমাকে বড় লজ্জিত করিয়া তুলে।

অথচ তাহার উদ্দেশ্যটুকু বুঝিতে পারি।

এই আত্মীয়-স্বজনহীন নির্ব্বান্ধব বিদেশে এই নিকটতম আপনজনের মত অকৃত্রিম দরদটুকু সত্যই বড় ভাল লাগে।

কিন্তু নিরুপায়। নিমন্ত্রণ ত আমি কখনও খাই না কারুর বাড়ীতে। বলি—কি হবে বাবা শিবরাম, নেমন্তন্ন ত আমি খাই না কোথাও।

শিবরাম মিনতিপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চায়। বুঝিতে পারি সে ক্ষুণ্ণ লইয়াছে।

বলি,—দুঃখু করলে শিবরাম? কিন্তু কি করব বাবা, নেমন্তন্ন খেলে যে আমার অসুখ করে।

শিবরাম তাড়াতাড়ি বলে,—না না, তবে থাক্ বাবা, দরকার নেই। এই বিদেশে-বিভুঁয়ে অসুখ-বিসুখ হলে দেখ্‌বে কে? আমি অবশ্য আছি, কিন্তু তা বলে অসুখ-বিসুখের কি একটা কষ্ট নেই!

অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিয়া যাই।

শিবরামের মনটি কিন্তু বড় খোলসা, কোন কথাই চাপিয়া রাখিতে পারে না। বলে,—আমি ত সেই কথাই বলি বাবা, নেমন্তন্ন খাওয়া কি সকলের সহ্য হয়? কিন্তু বাড়ীতে যে কথা শোনে না। বলে, অন্তত একটি দিনও এনে যদি খাইয়ে দাও।

বুঝিতে পারি এ আহ্বান শিবরামের নিজস্ব নহে, তাহারই অন্তঃপুরের যিনি তরুণী অধিশ্বরী, এ আহ্বান তাঁহারই।

মনে-মনে বড় তৃপ্তি পাই। এই সুদূর পল্লীপ্রান্তে তবে শিবরাম ছাড়া আরও একজন আছে, যাহার স্নেহ-কোমল দরদী অন্তরে আমার জন্য একটি আসন পাতা।

বড় ভাল লাগে ঐ অযাচিত অধিকারটুকু। যখনই ভাবি, কেমন যেন আরাম পাই!

বেলা পড়িয়া আসে, মেয়েরা জল আনিতে যায়, নিমের শাখে কোকিল ডাকে, সন্ধ্যার বাতাসে ফুলের গন্ধ। সেই তরুণী বধুটি জল লইয়া ঘরে ফিরে। আজ আর নীলাম্বরী নহে, পেঁয়াজী রঙের একখানি ধূপছায়া-পাড় সাড়ী। টুকটুকে আল্‌তা-রাঙা পা দু'খানি, প্রতি পদক্ষেপে যেন মাটির বুকে স্থলপদ্ম ফোটে—মরালের মত গতিটুকু কী মন্থর! বেশ দেখায়।

চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দেখি। মনে হয় স্ত্রীলোকের রূপে কি যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে!

লোকে দেখিলে মন্দ ভাবিবে বুঝি, কিন্তু তবু যেন দৃষ্টিটুকু কিছুতেই ফিরাইতে পারি না! কী দুর্ব্বল মন এই মানুষের!

আঁখি-তারার বোধ হয় নিজের একটা পিপাসা আছে, ঐ সৌন্দর্য্যটুকু তার পানীয়!

বুঝিতে পারি না শুধু এই চোখের চাওয়ায় এমন কি গুরুতর অপরাধ হয়!

বুঝিতে পারি আমার এই চোখের চাওয়ার ফাঁস লাগিয়াছে ঐ দু'টি আলতা-রাঙা কোমল পায়ে।

বাতাসের কারসাজী—সন্ধ্যা-ধূসর পল্লীপথের নির্জ্জন বাঁকে সহসা একাকী ঘোমটা খুলিয়া তাহাকে আদর করে।

চমৎকার! অবগুণ্ঠনের অন্তরালে কৃপণের ধনের মত এতদিন যাহা গোপন ছিল আজ সহসা তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে!

সুন্দর মুখ খানি!

মনে হয় উহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি।

অতীত দিনের অন্ধকারে স্মৃতির বাতি জ্বালাইয়া খুঁজিয়া ফিরি।

মনে পড়ে—হ্যাঁ, ঐ মেয়েটিই বটে। অদৃষ্টের পরিহাস! এমন ভাবে উহাকে এখানে দেখিব কবে ভাবিয়াছিলাম!

বিবাহের কথা হইয়াছিল আজ বোধ হয় বছর তিনেক পূর্ব্বে; কয়েকটি বন্ধু লইয়া নিজেই গিয়াছিলাম মেয়ে দেখিতে, দেখিয়া পছন্দও হইয়াছিল। কিন্তু বিবাহ হয় নাই, বোধ হয় আমারই বাবার অমতের জন্য।

বউটি প্রতিদিন সন্ধ্যায় পদ্মদীঘি হইতে জল লইয়া যায়। দেখি। অনেক কথাই মনে জাগে।

হয়ত মেয়েটির ভালই হইয়াছে, স্বামীর ভালবাসা, শাশুড়ীর যত্ন, শ্বশুরের স্নেহ, সুখের সংসারে অভাব নাই।

কিন্তু এই ছন্নছাড়ার জীবনের সহিত যদি উহার অদৃষ্ট জড়াইয়া যাইত, আমি কি সুখী করিতে পারিতাম উহাকে?

কিন্তু এমন হওয়াও ত অসম্ভব ছিল না যে, আমিই হইতাম ঐ মেয়েটির সব চেয়ে বড় আপনার আর ঐ মেয়েটিই হইত আমার সব চেয়ে বড় প্রিয়জন! ঐ নির্ভরশীল শুভ্র সুগোল বাহু দু'টি আমারই কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া পৃথিবীর এই বন্ধুর পথে—

বুঝি, পরস্ত্রী লইয়া প্রকাশ্যে না হউক, মনে মনেও এই যে জল্পনাটুকু, ইহাও পাপ।

কিন্তু এই পাপের মধ্যেও কেমন যেন একটা মাধুর্য্যের মাদকতা আছে, যাহার ঐ আমেজটুকু মানুষের মন কিছুতেই যেন আর কাটাইয়া উঠিতে পারে না!

ভাবি, ইহার জন্য দায়ী কে? মানুষ নিজে, না তার সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান?

সেদিন সকালে শিবরাম আসিয়া বলিল,—বড় বিপদ। আপনাকে এক্ষুণি একবারটি আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে। বড় বিপদ!

জিজ্ঞাসা করিলাম,—ব্যাপার কি শিবরাম?

শিবরাম বলিল—আপনার বৌ-মা'র বড় অসুখ বাবা। হঠাৎ কাল রাত্তিরে ভয়ানক জ্বর—টেম্পারেচার একশ' চার কি পাঁচ—একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য! বুকেও বোধ হয় সর্দ্দি বসেচে।

আমার বৌ-মা!

অর্থাৎ শিবরামের স্ত্রী।

উঠিতে হইল।

ইহার পূর্ব্বে আর কোন দিন কিন্তু আমি শিবরামের বাড়ীতে যাই নাই। দেখিলাম ডিস্‌পেন্সারী হইতে বাড়ীটি বেশী দূরে নহে।

ছোট্ট মাটির ঘর, বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

কিন্তু—এ কি!

রোগিণী দেখিয়া অবাক হইলাম।

এ যে সেই মেয়েটি! আমার একলা-থাকার অলস বেলার সঙ্গিনীটি!

হাত দেখিতে হাত কাঁপে, বুক পরীক্ষা করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয় কিন্তু আমি ডাক্তার!

মনে হয়, ঈশ্বরের বিদ্রূপ বড় মর্মান্তিক!

রোগী দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম।

বুঝিতে পারি, বুকের ভিতর কোথায় যেন খানিকটা একেবারে চিরদিনের মতই অসাড় হইয়া গিয়াছে।

হউক পাতান সম্বন্ধ, তবুও শিবরাম ত আমাকে বাবা বলিয়াই ডাকে।

পরমায়ু থাকিলে মানুষ মরে না। অসুখও সারে, চিকিৎসকেরও নাম যশ বাড়ে।

নিউমোনিয়া নহে—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

অল্প কয়েক দিনেই মেয়েটি সারিয়া উঠিল।

সেই একটি দিন মাত্র, শিবরামের বাড়ীতে আর কোনও দিন যাই নাই। শিবরাম রিপোর্ট আনিয়াছে, আমি ব্যবস্থা দিয়াছি।

মেয়েটি সারিল, . . .

শুনি, অল্পে অল্পে গায়েও জোর পাইতেছে—

শেষে একদিন প্রতিদিনকার মত আবার কলসী কাঁখে ঘাটের পথে দেখা দিল।

সূর্য্য তখন ডুবুডুবু, বিদায় বেলার শেষ চুম্বনটি পদ্ম-দীঘির স্বচ্ছ জলে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। নিমের শাখে কোকিলও ডাকে। সন্ধ্যার বাতাসে ফুলের গন্ধ ঠিক পূর্ব্বের মতই ভাসিয়া আসে।

কিন্তু আমার যেন কি হইয়াছে, কে যেন ছিল আমার সব চেয়ে বড় আপনার জন, আজ সহসা সে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে!

খুঁজিতে সাহস হয় না অথচ প্রাণ হা-হা করে।

আমার অন্তরের অতল তল হইতে যেন কাহার অস্ফুট ক্রন্দনের ধ্বনিটুকু শুনিতে পাই। উত্তপ্ত বালুচরে মরণাহতা নদীর ক্ষীণ আর্ত্তনাদের মত।

হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে যে বাসনাটি ইহ জীবনের মত সমাধি লাভ করিয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, আজ সহসা তাহার নবজীবনের সাড়া পাইয়া বিস্মিত হই।

এতখানি তৃষ্ণা! কই এতদিন ত ইহা একদিনের জন্যও বুঝিতে পারি নাই।

বেশ ছিলাম, কিন্তু এ কী হইল?

নিজের দিকে চাহিতে পারি না, মনে হয় যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া ঐ একটি পিপাসাই আমার চির-অতৃপ্ত আত্মাটিকে নিপীড়িত করিয়া আসিতেছে।

সংস্কারের মোহ মানুষকে চিরদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। এক একদিন মনে হয় পাতান সম্পর্কের মূল্য কি?

বুভুক্ষু অন্তরাত্মাকে বঞ্চিত করিয়া রাখি এ অধিকার আমার নাই।

মানুষ পাথরে গড়া দেবতা নয়, সেই জন্যই ত ভয় হয়!

ভাবি, প্রবৃত্তির ঐ দুরন্তপনাটুকু ঘুচিবে কবে?

শিবরামের চক্ষু দু'টি ছল্ ছল্ করিতেছিল।

বলিল,—বাবা, কথাটা কি সত্যি?

আমি বলিলাম,—হ্যাঁ বাবা, এ জায়গাটা আমার আর মোটেই ভাল লাগ্‌ছে না। তাই এক মাসের নোটিশ দিয়ে রেজিগ্‌নেসন্ পেশ করেছি।

স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, শিবরামের চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

কিন্তু বলিব কি?

মনে মনে ভাবিলাম, বুঝি সবাই বাঁচিলাম!

কথা-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে রসস্রষ্টা আছে, তাহার একটি সুনির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। যখনই যে ধারার ভিতর দিয়া চলিয়াছে, তাহার বিশেষ গতি, বেগ ও বর্ণ লইয়া তাহা আপন সত্তাটিকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের প্রবাহ তাহাকে একটি বিশেষ প্রণালীতে আবদ্ধ থাকতে দেয় নাই, অনেকখানি ভাব-বিস্তারের উপর ছড়াইয়া দিয়াছে। সেই জন্যই কাব্য-সাহিত্যের বাহিরেও একটা প্রকাণ্ড রবীন্দ্র সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। নাট্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শিশু-সাহিত্যেও তাঁহার দানের মূল্য অনেক। সাহিত্যিক সমালোচনার পথ তিনি অনেক বড় বড় বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া কাটিয়া লইয়া গিয়াছেন। বাংলার ছোটগল্পের তিনিই স্রষ্টা বলা যাইতে পারে। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার শেষ দানদুইটি বিশ্বসাহিত্যের গৌরব-বৃদ্ধি করিতেছে।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য জীবনে রবীন্দ্রনাথ একটা ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রতিভার বিকাশ একদিনে হয় নাই—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আত্মপ্রকাশের প্রবল প্রচেষ্টার ফলেই তিনি সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার প্রথম রচিত উপন্যাসগুলিতে আর্টের চরম উৎকর্ষ দেখিবার আশা করিলে ভুল করা হইবে। মোটের উপর তাঁহার উপন্যাস-গুলিকে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী চারিটি স্তরে বিভক্ত করা চলে। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' প্রথম স্তরের রচনা।

প্রথম রচনা

'বৌঠাকুরাণীর হাট' তরুণ রবীন্দ্রনাথের রচনা। কাব্য ও গদ্য-সাহিত্যের মাঝে তাঁহার প্রকৃত পথ রবীন্দ্রনাথ তখনও খুঁজিয়া পান নাই। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর কবিতাগুলি সবে মাত্র লেখা হইয়াছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে প্রকাশিত য়ুরোপের চিঠি, মেঘনাদবধের সমালোচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ গদ্যলেখক হিসাবে তাঁহাকে খ্যাতির পথে লইয়া চলিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে বিশেষ কোনও একটা সাহিত্যিক ধারায় আবদ্ধ থাকিবার কথা নয়। সাহিত্যের নূতন নূতন রূপের মাঝে নিজেকে ছড়াইয়া দেওয়াতেই ছিল তাঁহার আনন্দ; এ ভাব এখন পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকিয়া রবীন্দ্র প্রতিভাকে বহুমুখী করিয়া তুলিয়াছে।

এই নূতনের মাঝে প্রকাশ লাভ করিবার আগ্রহ হইতেই 'বৌঠাকুরাণীর' জন্ম হয়। সে সময়ে বাংলায় ভাল উপন্যাস সংখ্যায় অল্প ছিল। সেইজন্য 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এর অনাবিল হাস্যরস বিশেষ উপভোগ্য হয়। আধুনিক সাহিত্যে ইহার উচ্চ স্থান না থাকিলেও সাময়িক মূল্য ছিল বলিয়া ইহা উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি' ইহার কয়েক বৎসর পরে লিখিত হয়। ইহাতেও প্রতিভার বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। 'রাজর্ষি' গল্পাংশ লইয়াই রবীন্দ্র-নাথ পরবর্ত্তী সাহিত্যজীবনে তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক 'বিসর্জ্জন' লিখিয়াছিলেন।

'রাজর্ষির' সহিত উপন্যাস-রচনার একটা স্তর সমাপ্ত হয়। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তরস্থ কবি-ভাব তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল—কিছুদিনের মত ঔপন্যাসিকের কোনও স্থান রহিল না। 'সোনার তরী'র স্রষ্টা কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র দেখিয়া তাহাতেই নিবদ্ধ

রহিলেন। কিন্তু শুধু সৌন্দর্য্যের অনুভূতি রবীন্দ্রনাথকে ডুবাইয়া রাখিতে পারিল না। মানবজীবনের বিভিন্ন দিক-গুলির সহিত তাঁহার পরিচয় এই সময়েই আরম্ভ হয়। শিলাইদহের পল্লীজীবনের শান্ত মাধুর্য্য তাঁহার চিত্তে নূতন নূতন চিন্তাধারা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। প্রকৃতির মাঝে যে অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভার রহিয়াছে তাহার সহিত মানবের যোগ কোথায়? যেখানে সে সত্যকারের মানুষ, সেখানে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ স্বার্থের সংঘাত হইতে দূরে তাহার অন্তরাত্মা জাগিয়া রহিয়াছে—পুরুষ যেখানে কর্ম্মী, নারী ভালবাসার প্রতিমা ও মাতৃত্বে মহিমময়ী—সেইখানেই সংস্কার ও সভ্যতার মোহবিহীন-ভাবে প্রকৃতির সহিত সে তাহার যোগসূত্র খুঁজিয়া পায়। তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় রবীন্দ্র-নাথ মানব-মনের এই গভীর দিক্‌টার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তব-রাজ্যের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রুর বিশ্লেষণ করিয়া তিনি মানুষের আলো ও ছায়াময় যে রূপটা বাহির করিয়া ধরিলেন, তাহা তাঁহার কাছে এক নূতন সাহিত্যিক ধারার পথ খুলিয়া দিল।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লেখা আরম্ভ করেন। দৈনন্দিন জীবনের সামান্য একটু ঘটনা—তাহাই তাঁহার কাছে ভাবময় হইয়া দেখা দিতে লাগিল। এই গল্পগুলিতে কোথাও ভাষার আড়ম্বর নাই—তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস নাই; স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা ইহাদের বিশেষত্ব। ইহাদের চরিত্রগুলিতে অঙ্কন আছে—চিত্রণ নাই; রেখাই ইহাদের সর্ব্বস্ব—রঙ্ ফলাইবার প্রয়াস কোথাও দেখা যায় না। 'কাবুলিওয়ালা' 'রাসি' ইহারা শুধু আপন আপন বিশেষ হৃদয়ভাবটি লইয়াই দেখা দেয়। ইহাদের মধ্যে যে পিতা, তাহার পিতৃভাবটিই ফোটানো হইয়াছে—বাকিটুকুর কোনও ইঙ্গিত নাই যে মাতা, তাহার মাতৃত্বই আমাদের মুগ্ধ করে; সে যে মাতা ভিন্ন আরও অনেক কিছু হইতে পারে—প্রিয়া, প্রেমিকা, জীবনসঙ্গিনী—সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভার মূল ভিত্তি গড়িয়া উঠিতেছিল। ছোটগল্পের মধ্যে তিনি খণ্ডভাবে সৃষ্টি করিতেছিলেন, কিন্তু শুধু ইহাতেই তাঁহার তৃপ্তি হইল না। পূর্ণ চরিত্র সৃষ্টির আনন্দ লাভের বাসনা তাঁহার মনে জাগিল। সেইজন্য তিনি রেখাচিত্র ছাড়িয়া নানা বর্ণের তুলিকা-সম্পাতে চরিত্র চিত্রণ আরম্ভ করিলেন। এইবার তাঁহার উপন্যাস-রচনার নূতন পর্য্যায় আরম্ভ হইল

দ্বিতীয় স্তর

'নৌকাডুবি' ও চোখের বালি' এই নবভাবের প্রেরণায় লিখিত। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'র সহিত ইহাদের প্রধান পার্থক্য এই যে ইহারা শুধু বাহিরের ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত লইয়াই থাকে নাই—মানব হৃদয়ের বৈচিত্র্য বোধ ইহাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

এই দুইটি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের পরিণত প্রতিভার রচনা না হইলেও একটা অর্দ্ধবিকশিত শক্তির আভাসে ইহা ভরপুর। আর্ট হিসাবে চোখের বালি'র স্থান 'নৌকাডুবি' হইতে উচ্চে। 'নৌকাডুবি'তে মাধুর্য্য থাকিলেও গভীরতা নাই। লেখক কয়েকটি অবস্থা-বিপর্য্যয় (situation) সৃষ্টি করিয়া তাঁহার চরিত্রগুলিকে তাহাদের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে যেখানে মনস্তত্বের গূঢ় জটিলতা দেখাইবার কথা সেখানে তিনি অন্য এক সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছেন; যেখানে ট্রাজেডি ঘনাইয়া উঠিতেছে সেখানে অতি সাধারণ মিলন সংঘটিত করায় প্লটের বিশেষত্বের হানি হইয়াছে। উপন্যাসের নায়িকা কমলা রমেশকে তাহার স্বামী ভাবিয়া ভুল করিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। যেদিন সে জানিল যে, রমেশ সত্যই তাহার বিবাহিত স্বামী নয়, সেইদিনই তাহার সব ভালবাসা লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার পর রমেশের গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইয়া অনেক সন্ধানে প্রকৃত স্বামী নলিনাক্ষের দেখা পাইয়াই সে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। এই দ্বিতীয়বার ভালবাসা ঠিক স্বাভাবিক নহে। একটা যুগ-সঞ্চিত সংস্কারের অত্যাচার ইহাতে সূচিত হইয়াছে। ইহা নলিনাক্ষকে ভালবাসা নয়—তাহার 'স্বামীত্ব'কে ভালবাসা।

এইরূপ ভালবাসা যে কত বড় ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরে কি কঠোর ট্রাজেডির সৃষ্টি করিতে পারে, লেখক তাহার ইঙ্গিত করেন নাই। আর্ট হিসাবে এইখানেই 'নৌকা-ডুবি'তে অসৌষ্ঠব রহিয়া গিয়াছে।

'নৌকাডুবি'তে রবীন্দ্রনাথ একটা নূতন লিখন-কৌশল আনিয়াছেন—সংযম। সংযমেই ইহার প্রাণ।

'চোখের বালি'তে উন্নততর শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত চরিত্র-সৃষ্টি ইহাতেই প্রথম হইয়াছে। 'নৌকাডুবি'র কমলা ঠিক বাস্তব নহে, হেমনলিনী সুন্দররূপে চিত্রিত হইলেও তাহাতে বিকাশের অভাব আছে। সে আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি পাইতে পারে, কিন্তু এই প্রশংসার মধ্যে আমরা লেখককেই দেখি। পক্ষান্তরে 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর সহিত পরিচিত হইবার সময়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভুলিয়া যাই। প্রাণ-শক্তিতে পূর্ণ এক নারী বিচিত্র জীবনধারার মধ্য দিয়া সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—কোথাও সে যেন উচ্ছ্বাসের প্রবলতায় নিজেকে ভাঙিয়া চুরিয়া লুপ্ত করিয়া দিতে চায়—আবার কোথাও দুর্দ্দম হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া সহসা মুহূর্ত্তেকের জন্য নিশ্চল নির্ঝরিণীর মত রহস্যাকুল দেখায়। বিনোদিনী ভালবাসার সহিত খেলা করিতে গিয়া নিজেই ভালবাসিয়া ফেলিল। এখানে আমাদের 'চরিত্রহীন'-এর কিরণময়ীর কথা মনে পড়ে। যাহাকে সে ভালবাসিল সে 'চরিত্রহীন'-এর উপেন্দ্রের মতই কঠোর তপস্বী। বিহারী নিজেকে ধরা দিল না। প্রাণহীন আবেষ্টনীর মাঝে জীবনের অনেকগুলা বৎসর কাটাইয়া বিনোদিনীর অন্তরের তৃষ্ণা শুকাইয়া যায় নাই—শুধু মরুভূমির মত উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বিহারীকে দেখিয়া তাহার নিরুদ্ধ চিত্তবৃত্তিগুলি সহসা বন্যার নদীর মত প্রবল হইয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল—বাধা পাইয়া তাহা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নারী যখন সত্য সত্যই ভালবাসে তখন সে নিজেকে একেবারে নিঃশেষ-নির করিয়াই দান করে—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব তাহার কাছে লুপ্ত হইয়া যায়। বিনোদিনী বিহারীর কাছে আত্মনিবেদন করিল। কিন্তু বিহারী পাষাণ দেবতা। বিনোদিনীর উদ্দাম ভালবাসায় সে নিজেকে ধরা দিল না।

একটা প্রাণের লীলা একটা পূর্ণ হৃদয়ের সৌন্দর্য্যময় অর্ঘ্য মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে স্পন্দন জাগায়। তাই বিহারী একবার জয়যুক্ত হইয়াও নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। দূরে সরিয়া গেল—যাহাতে পুনর্ব্বার প্রলোভন না আসে। সন্ধান করিতে করিতে বিনোদিনী যখন বিহারীর দেখা পাইল তখন তাহার মধ্যে আর আবেগের প্রবলতা নাই—বিনোদিনী তখন শান্ত। উচ্ছ্বাস ও চঞ্চলতা ছাড়িয়া সে সাগরের মত গভীর হইয়া পড়িয়াছে। বিহারীর সহিত যে মিলন তাহার এত আকাঙ্ক্ষিত ছিল, এবার সে তাহা অগ্রাহ্য করিল। ভালবাসাতেই তাহার ভালবাসার সমাপ্তি, যে মিলনে সমাজের সহিত তাহার প্রিয়ের সংঘর্ষ অনিবার্য্য, তাহা সে চাহিল না। বিনোদিনীর পূর্ব্বের আত্মদান অপেক্ষা এই আত্মবোধ অনেক অধিক মহত্তর ও মহিম।

'চোখের বালি'র অন্যান্য চরিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়—বিনোদিনীর পরিকল্পনায় শ্রেষ্ঠতা তাহাদের একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

তৃতীয় পর্য্যায়—গোরা

আর্টিষ্টের আত্মা কখনও ভাব ও বিষয়ের ঐক্যে তৃপ্ত হইতে পারে না—তাহা বৈচিত্র্য চায়। প্রতিভার ক্রম-বিকাশের সহিত রবীন্দ্রনাথ এই বৈচিত্র্যের উপলব্ধি নিবিড় হইতে নিবিড়তর ভাবে লাভ করিয়াছেন। উপন্যাস মানব-হৃদয়ের ইতিহাস, সাধারণ মানুষের অন্তর ও বাহিরের সম্পর্কটুকু, তাহার সুখ দুঃখের অনুভূতি, তাহার সকল কার্য্যের নিয়ামক মানসিক শক্তিগুলির স্বরূপ—ইহাদের নির্ণয় ও বিশ্লেষণে ঔপন্যাসিকের বিশেষ সার্থকতা। কিন্তু আর এক জাতীয় উপন্যাস আছে যাহা শুধু এই রূপ চিত্রণেই সম্পূর্ণ নয়; তাহা বাস্তবের মাঝে ভাব বা আইডিয়া আনিতে চায়। রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্য-বোধ ও উন্মেষশালী প্রতিভা এই বিশেষ প্রকৃতির উপন্যাস রচনায় পথ অবলম্বন

করিল। ইহার ফলে 'গোরা'র সৃষ্টি; গোরা একটি আইডিয়া।

আধুনিক সভ্যতা হইতে যে সকল দোষের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা একটি। জীবনের সহজ প্রেরণাগুলিকে নির্ব্বাসিত করিয়া মানুষ তাহার চারিদিকে অর্থহীন বিধি ব্যবস্থার জালাবরণ গড়িয়া তুলিতেছে। এ বিষয়ে পশ্চিম বিশেষ অগ্রসর। পশ্চিমের বাহিরটা দেখিয়া ভারত অন্ধের মত তাহার অন্ধকার দিক্‌টার অনুকরণ করিতেছে। ফলে তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। ইহা মৃত্যুর সূচনা।

'গোরা' এই মনোভাবের বিরুদ্ধে মূর্ত্তিমান্ বিদ্রোহের মত। একটা প্রচণ্ড শক্তি তাহার মধ্যে সংহত হইয়া আছে। মন ও দেহ দুইটাকেই সে শক্তিতে ভরিয়া তুলিয়াছে। তাহার ব্যক্তিত্বে (personality) দীপ্তি আছে, এবং বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সন্ধিস্থাপন করা তাহার একেবারে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যাহা সে বিশ্বাস করে তাহা জোর করিয়াই বলে এবং কার্য্যেও রূপান্তরিত করিয়া থাকে। তাহার বিশ্বাসের মূলে sincerity থাকিলেও সে একটা ভুল করিয়াছিল:-- হিন্দুত্বের সারবস্তুটি লইয়াই সে ক্ষান্ত হইতে পারে নাই—বাহ্য সংস্কারের বোঝাটাকেও সে সত্য বলিয়া ভাবিয়া লইল। এ ভুল ভাঙিল বড় তীব্র, কঠিন আঘাতে। আনন্দময়ী যখন জানাইলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের উপর তাহার জন্মগত অধিকার নাই, যখন সে বুঝিল তাহার সবটুকু জীবনীশক্তি দিয়াও সে হিন্দুসমাজের উপর নিজের কোন দাবী দেখাইতে পারে না—তখন অকস্মাৎ যেন একটা প্রবল ভূমিকম্পে তাহার মিথ্যার প্রাসাদ ভাঙিয়া পড়িল। যে সত্যকারের হিন্দুত্ব সংস্কার ও সামাজিক বিধি হইতে অনেক উচ্চে, যাহা মানুষকে জন্ম-সূত্রে নয়—মনুষ্যত্বের মুক্তক্ষেত্রে মিলিত হইতে শিখায়—সেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মবোধ গোরার প্রাণে ইহার পর হইতে জাগ্রত হইয়াছে। যাহাদের জন্য তাহার সারা জীবনের প্রাণান্তকর প্রয়াস, তাহাদের সহিত তাহার রক্তের সম্বন্ধ নাই—সে ভারতীয় নয়, আইরিশম্যান্। প্রাণের এই শূন্যতা গোরাকে একটা নূতন পূর্ণতার সন্ধান দিয়াছে; তাহা—মহামানবত্বের উপলব্ধি।

একশ্রেণীর মানুষ আছে যাহাদের মধ্যে সহজ-বোধ (instinct) বিশেষরূপে প্রবল। আনন্দময়ী ইঁহাদেরই একজন। জীবনের বড় বড় সত্যগুলা তাঁহাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয় নাই; তাহারা স্বতঃব্যক্ত। তাঁহার স্নেহে জাতি-বিচার নাই—ইহাই তাঁহার সত্যানুভূতির কষ্টিপাথর। কিন্তু গোরাকে বিজাতীয় জানিয়াও তিনি নিজের মাতৃহৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য আপন করিয়া লইয়াছিলেন—বহুযুগের সংস্কারের বোঝা তাঁহার মনে দ্বিধা আনিতে পারে নাই, এ পথ ভবিষ্যতে কিরূপ ভয়ানক সমস্যাময় হইয়া উঠিতে পারে, তাহা জানিয়াও তিনি অবিচলিত ছিলেন।

আনন্দময়ীর প্রভাবে গোরা ব্যথা সহিতে শিখিয়াছিল; তাই বেগে চলিতে চলিতে বার বার প্রতিহত হইয়াও সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। আঘাত পাইয়া সে আরও জ্বলিয়া উঠিয়াছে; এই প্রাণের লীলাই তাহাকে সুচরিতার প্রেমের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে।

সুচরিতা একটি খাঁটি চরিত্র। সংসারে আপনার প্রকৃত স্থানটুকু চিনিয়া লইয়া সে তাহার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। যাহারা তাহাকে চাহে না, তাহাদের উপর সে কোনও অভিমান রাখে নাই; শুধু পরেশবাবুই তাহার ব্যথা বুঝিতেন;—আনন্দময়ী পরে বুঝিলেন। নিজেকে সে কখনও জানায় না, কারণ সে বোঝে যে, জগৎ তাহাকে জানিতে একেবারেই ব্যস্ত নয়। বাহিরের তাহাকে প্রয়োজন ছিল না বলিয়া সে আত্মসংস্থিত হইয়া নিজেকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রচুর সময় পাইয়াছিল; ইহারই ফলে তাহার মধ্যে এত গভীরতা ও সংযম আসিতে পারিয়াছে। আপনার অন্তরের শক্তি ও দীপ্তি গোরার মধ্যে প্রতিফলিত দেখিয়া সে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিল। গোরার ভালবাসাতেও এই একই রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

বিনয় জীবনটাকে বাহির হইতেই দেখিয়া লইতেছিল—ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে নাই। হঠাৎ ললিতার ভালবাসায় সে প্রাণের উৎস খুঁজিয়া পাইল; ইহার পর সে সহজের মায়া কাটাইয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছে।

ললিতার চিত্রণে মাধুর্য্য আছে,—সূক্ষ্মতা নাই। সে

আবেগের সহিত চলিতে চলিতে আঘাত পাইয়া বর্ষার নদীর মত প্রবল ও গভীর হইয়া উঠিয়াছে। তখন বাস্তব-জগতের কঠিনতা তাহাকে রোধ করিয়া রাখিতে পারে নাই।

পরেশ সুখ ও দুঃখের মাঝে ভেদের রেখা টানেন নাই। জীবনে যাহা কিছু আসিয়াছে তাহাই তিনি নীরব হাস্যে মানিয়া লইয়াছেন। ব্যথা তাঁহার মনের স্পর্শে আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে।

এতগুলি বিভিন্ন ভাবের চরিত্রের একত্র সমাবেশ ও সুনিপুণ চিত্রণ 'গোরার' একটা বিশেষত্ব। আইডিয়াকে বাস্তবের দেহ দিয়া প্রাণময় করিয়া তুলিবার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ কোথাও অস্পষ্টতা আনেন নাই। সব চরিত্র গুলিই আপন আপন ভাবে সুসম্পূর্ণ হইয়াছে।

গোরা উপন্যাসটিতে সাময়িক ভাবের অত্যধিক ছায়াপাত হইয়াছে। ইহার রচনার সময়ে বাঙলার চিন্তারাজ্যে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। যাহা কিছু জীর্ণ, যাহা পুরাতন, তাহা বিধ্বস্ত হইতেছিল ও সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নূতনের জয়ধ্বজা উড়িবার উপক্রম করিতেছিল। এই ভাব দেখাইতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেকেই অনেকখানি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। পরেশের মধ্যেও যেন দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে। নিজেকে গোপন রাখাতেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা—কিন্তু কবির ধর্ম্ম বিশ্বের সহিত আপন অন্তরাত্মার যোগবিধান করা। অসাধারণ চরিত্র-সৃষ্টির ক্ষমতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে খাঁটি ঔপন্যাসিক বলিয়া ভাবিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহার অন্তর-রাজ্যে কবি-ভাব উপন্যাসকারকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি—তাহার পর ঔপন্যাসিক।

"ঘরে বাইরে"

মানবের মন অসীম বলিয়াই নিত্য-নূতন। এই নূতনত্ব ঠিক্ বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া যায় বলিয়া সাধরন মানুষ তাহার কোনও সন্ধান পায় না। ভাবদ্রষ্টা ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্ত মনের গভীর রন্ধ্রে নামিয়া গিয়া তাহার ভিতর আলোক-পাত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই আলোক দিবালোকের মত স্বচ্ছ নয়—গোধূলীর আভার ন্যায় অর্দ্ধব্যক্ত। ইহার ফলে আমরা অন্তরলোকের যে রূপ দেখিতে পাই তাহা বাস্তবের মত সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় না;—অনেকটা ছায়ালোকে জানা ও অজানার মাঝে থাকিয়া যায়। অরূপকে রূপের মাঝে ব্যক্ত করার, অদৃষ্টকে দৃষ্ট করিতে যাওয়ার ইহাই ফল।

মনের এই বিশেষ তত্ব না বুঝিলে 'ঘরে বাইরে'র মধ্যে অনেকখানি অসঙ্গতি চোখে পড়িবে। ইহার চরিত্রগুলি নিজেদের গোপন রাখিয়াছে; শুধু মাঝে মাঝে ইঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। অন্ধকার রাত্রির বিদ্যুতের মত সেই ইঙ্গিতে তাহাদের ভিতরটা ক্ষণেকের জন্ত দেখা দিয়াই মিলাইয়া যায়।

নিখিলেশ বিমলাকে খুব সাধারণ ভাবেই পাইয়াছিল; কিন্তু এরূপ পাওয়ায় সত্য নাই বলিয়া সে অতৃপ্ত রহিয়া গেল। সমাজ যেখানে দুইটি নর ও নারীর মিলনসাধন করিয়া দিয়াছে সেখানে শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাব না হইলেও প্রকৃত ভালবাসা থাকিতেও পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। সহস্র লোকের ভিতর বিমলা যদি তাহাকেই বাছিয়া লয়, তবে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝা যাইবে। মিলনের এই মুক্ত ক্ষেত্রে বিমলাকে পাইবার জন্য নিখিলেশ উন্মুখ হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে বহির্জগতে সন্দীপের রূপ ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্দীপ বিমলার প্রেমের কষ্টিপাথর।

একটা তীব্র শক্তি সংহত হইয়া সন্দীপের সৃষ্টি করিয়াছে; সে ঝড়ের মত প্রবল—বাধা পাইলে আরও ভয়ানক হইয়া ওঠে। নিজেকে বড় করাই ছিল তাহার জীবনের মন্ত্র। দেশের সে সেবা করে, দেশ তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িবে বলিয়া; বিমলাকে সে পাইতে চায়, তাহার নারীত্বের সর্ব্বনাশের আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য। মিথ্যাকে সে সত্যের ছদ্মসাজে এমন করিয়া সাজায় যাহাতে তাহা ঠিক সত্যেরই মত দেখায়।

কিন্তু একটা বিষয়ে সন্দীপ সম্পূর্ণ খাঁটি ছিল। নিজেকে সে কখনও প্রতারিত করে নাই। সে জানিত, নিছক চিরন্তন সত্য বলিয়া জগতে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। একজনের পক্ষে যাহা সত্য, অপরের কাছে হয় তো তাহা

মিথ্যা। একযুগে যাহা সত্য, যুগান্তরে হয় তো তাহা একেবারে হেয়। সহজ মানুষের পক্ষে বাঁধা সত্যগুলিই চলিতে পারে। কিন্তু যে সহজের বাহিরে, যে অসাধারণ—তাহার নিজের জন্য নূতন নূতন সত্যের সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়। সন্দীপ তাহার স্বধর্ম্ম বুঝিয়াছিল। সে যাহা, তাহাই হইবে—অপর কিছু হইতে চাহে না, ইহাই ছিল তাহার আকাঙ্ক্ষা। আপনাকে জানিয়াছিল বলিয়াই সে এত শক্তিময় হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। এইখানে সন্দীপের সহিত 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মনস্তত্ত্বমূলক ঐক্য আছে।

প্রবৃত্তির সাধনা সন্দীপের পক্ষে সৌন্দর্য্যেরই উপাসনার মত। তাহার পরিকল্পিত সৌন্দর্য্যের বর্ণ ছিল গভীর কালো। রুদ্র, প্রচণ্ড, বীভৎসের মাঝে যে গোপন সৌন্দর্য্য দেবী বাস করে, সন্দীপ তাহারই উপাসক। তাই সে কামনার বস্তুকে হাতে পাইতে চায় ও পাইবার পরে তাহাকে পায়ে দলিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। ইহাতেই তাহার লীলা; একের মাঝে আবদ্ধ থাকিতে সে জানে না। ঝঞ্ঝার মত বিনাশের বাঁশি বাজাইয়া চলাতেই তাহার আনন্দ। বিমলাকে সন্দীপ তাহার প্রবৃত্তির অনলে আহুতি দিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তাহার স্থির চিত্তেও কোথা হইতে একটু সঙ্কোচ আসিয়া পড়িল। সন্দীপ তাহার নির্লিপ্ততা হারাইল। লীলার আনন্দে চলিতে চলিতে সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে—আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাই সে নিজের মনের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিতেছে, 'আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়চি, মনে হচ্চে আমার জীবনে বিমলা বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে . . . আমার ধারণা ছিল আমি ঝড়ের মত ছুটে চলতে পারি—ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত করে না। কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চারিদিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি ভ্রমরেরই মত,—ঝড়ের মত নয়।" সন্দীপের ফলাকাঙ্ক্ষা, তাহার প্রচণ্ড প্রখর লোভ অবশেষে লূতাতন্তুর মত তাহার পায়ে জড়াইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

সন্দীপের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায় মাষ্টার মশায়ের একটা কথায়—"সন্দীপ অধার্ম্মিক নয়, ও বিধার্ম্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ, চাঁদই বটে কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েচে।"

নারী উচ্ছ্বাসময়ী; তাহার মধ্যে বিচার-বুদ্ধির বিশেষ স্থান নাই। কোনও হৃদয়বৃত্তির দ্বারা একবার চালিত হইলে সে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া সর্ব্বনাশের সুরায় অভিভূতের মত ছুটিয়া চলিতে থাকে; নিজেকে ভাঙিয়া চুরিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। বিমলা বলিতেছে, "আমরা নদীর মত, কূলের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।" তাই সন্দীপের প্রবল আকর্ষণে, তাহার পৌরুষের মোহে অনেক চেষ্টাতেও বিমলা নিজেকে থামাইতে না পারিয়া পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়, তেমনি আত্মহারার মত স্পন্দিতহৃদয়ে ধ্বংসের পথে বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বিমলার মধ্যে দুইটি সত্তা আছে। একটা—খুব গভীর; তাহা নিখিলেশকে ভালবাসে। আর একটা চঞ্চল, অসংযত; তাহা সন্দীপকে পাইতে চায়। এই দুইটি বিরুদ্ধ সত্তার সংঘর্ষে বিমলার চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। সংঘর্ষের ভিতর দিয়া যত সহজে সত্য-বোধ হয় তেমন আর কিছুতেই নয়; আঘাতের পর আঘাত যতই তাহাকে বেদন বিদ্ধ করিতে লাগিল তাহার চিত্তশুদ্ধি ততই সহজ হইয়া উঠিল।

ধ্বংসের দুয়ারে পৌঁছিয়া বিমলা হঠাৎ থামিয়া গেল; মোহ ভাঙলে মানুষ যেমন চমকিয়া উঠে তেমনি করিয়া সে পূর্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। সন্দীপের আসল রূপটা তখন তাহার চোখে পড়িতে বিলম্ব হইল না; মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া সে দ্রুতবেগে ফিরিয়া চলিল।

এই ভুলভাঙার মূলে আছে এক বালক—সে অমূল্য। অমূল্যকে দেখিয়া সহসা বিমলার অন্তরের সুপ্ত মাতৃত্ব জাগিয়া উঠিয়া তাহার জীবনটা অনাস্বাদিত সুধায় ভরিয়া তুলিয়াছে। নারী যখন মাতৃত্বের আভাস পায় তখন আর বাহিরের মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে না; বিমলা তাহার প্রকৃত সত্তাকে দেখিতে পাইয়া বাহির ছাড়িয়া

ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে—যেখানে নিখিলেশের ভালবাসা তাহার জন্য আগ্রহাকুল হইয়া আছে।

নিখিলেশের মানসিক বিপ্লব বিমলার অপেক্ষা কম নহে। বিমলা যখন আলেয়ার আলোয় মুগ্ধ হইয়া আবিষ্টের মত চলিয়াছে, তখন নিখিলেশ তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে নাই। নগ্ন সত্যকে সে পাইতে চায়—সে যতই কঠিন ভয়াবহ হোক্। জীবন যখন সকল রূপ ও রস হারাইয়া একটা ব্যর্থতার বোঝা হইয়া উঠিতেছে, তখন সে গভীর হইতে গভীরতর অনুভূতির স্তরে নামিয়া ব্যথাকে সহজ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। হাসি দিয়া সে অন্তরের রিক্ততা পূর্ণ করিয়া তুলিতে চায়—কিন্তু ইহা তীব্র বেদনাময়। নিখিলেশ বুঝিতেছে—জীবনটা কাঁদিয়া কাটাইয়া দেওয়া সহজ; হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় কঠিন। এই কঠিনের সাধনাতেই তাহার মানবতার বিকাশ হইয়াছে।

জগতের অনেক ট্রাজেডিই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। একবার ভুলের পথে চলিলে হয় তো সারা জীবনের প্রায়শ্চিত্তেও তাহার পরিণামের অবসান হয় না। বিমলা আপন অন্তর-দেবতার সাড়া পাইয়া যখন ফিরিয়া চলিল তখন আর তাহার নূতন করিয়া জীবনের পাতা উল্টাইবার সময় ছিল না। নিখিলেশ আপনার প্রেমের ব্যর্থতায় পথচ্যুত হয় নাই—কাজের স্রোতে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া বিশ্বের বেদনায় সে আপন ব্যথা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিল। বিমলা ফিরিয়া আর পূর্ব্বের নিখিলেশকে পাইল না। ইহার পর অকস্মাৎ প্রজাবিদ্রোহের অনলে আহুতি পড়িল—বালক অমূল্য। নিখিলেশ আহত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে—বাঁচিবে কিনা বলা যায় না; বিমলার চোখে জল নাই; —হৃদয় তাহার হুহু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে বলিয়া চোখের জলও শুকাইয়া গিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তের সময় নাই—যাহা যায় তাহা চিরদিনের মতই যায়; আর কখনো ফিরিয়া আসে না।

The Moving Finger writes; and having writ,
Moves on: nor all thy Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line,
Nor all thy Tears wash out a Word of it.

—*Omar Khayyam*

ইহাই 'ঘরেবাইরে'র আসল ট্রাজেডি।

'ঘরে-বাইরে' কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ইহার সব কয়টি চরিত্রই পরিকল্পনায় ও সৃষ্টি-চাতুর্য্যে অতুলনীয়। রচনারীতির দিক্ হইতেও ইহা রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিতেছে। এমন সংযত, প্রাণময় ভাষা ও সহজ সাবলীল গতি শুধু শরৎচন্দ্রের মাত্র কয়েকটি ছাড়া বাংলার আর কোনও উপন্যাসে পাওয়া যায় না।

'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এ যে প্রতিভার বীজ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, 'ঘরে বাইরে'তে তাহা পরিণত ও পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে একটা বিষয় ভাল করিয়া বুঝা যায়—ইহার পিছনে রবীন্দ্রনাথের গভীর সাধনা রহিয়াছে। জীবনের বিভিন্ন দিকের সহিত পরিচয়ে তাঁহার হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি বাজিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় তিনি মানব-হৃদয়ের গভীরতা ও জটিলতার ভিতর প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সবটুকু দান এক করিয়া বিচার করিলেও মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটা দিক্ বাদ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা; এমন কি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই। মানুষ যেখানে সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে—হয় তো তাহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে সত্যের স্ফুলিঙ্গটুকু বাঁচিয়া আছে মাত্র—সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই না। জীবনের এই পাপের দিকটার চিত্রণে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ শক্তির পরিচয়ে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ইহার কারণ বুঝা সহজ। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রাণিত যে কবি-হৃদয় 'নৈবেদ্য' ও 'গীতাঞ্জলি'র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা তাঁহার উপন্যাসগুলিতেও ছায়া ফেলিয়াছে। তাঁহার চিত্ত রোমান্সের মত উপর দিকে উঠিয়া সুন্দরের মাঝে সত্যকে খুঁজিয়াছে; মলিনতার ভিতর নামিয়া তাহারও ভিতর যে পরম সত্য লুকাইয়া আছে তাহার সন্ধানলুব্ধ হয় নাই।

প্রাপ্তিস্বীকার

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

সহস্রকোটী প্রণাম অন্তে নিবেদন শ্রীশ্রীপদে
মোর শিরোনামে প্রেরিত 'বিনামা' পৌঁছেচে নিরাপদে।
এবারের দান হ'য়েছে গো প্রভু বড়ই মনঃপূত,
যেমন বেহায়া ঘাঁটাপড়া পিঠ, তেম্‌নি মোলাম জুতো।
তাহে বন্ধুর হাতের ছন্দে উত্তম-মধ্যম ;—
এ-দীন অধীন অধমে তোমার এখনও কত না দম !

তর্কে হারিয়া বুঝিতেছি নিট্‌—এ জীবন সুখে ভরা,
চৈত্র খরায় ভাগীরথী-বুক ভরে যেন বালুচরা।
কাঁদনের স্রোত বালির বাঁধনে পদে পদে বাধা পেয়ে
নৃত্য-নূপুর নিকনি চলে রুনু রুনু গান গেয়ে।
কভু আনন্দ ভরে,—
অন্তঃশীলা অশ্রু-প্রবাহ ধু ধু ধু বালুর চরে।

এবার বুঝিনু খুবই,—
যত মার খাও,—চেঁচিয়ে কান্না বেরসিকী, বেয়াদুবী।
মার-রহস্য তাঁরি রসিকতা, খাঁটী ভগবদ্গীতা,
শত্রুর হাতে মিছরীর ছুরি, বেত্রহস্তে মিতা।
মোটের উপর জগৎ যখন সুখে হেসে কুটোকুটি,
দুখবাদী-বৈরাগী-আহ্বানে কে আর আসিবে ছুটি ?
যাক্‌ সে আঁকিয়া নীরব শিশিরে অশ্রুর আলিপনা,

মরণ-উষায় অরুণ আসিয়া বানাবে হাসির কণা।
নেই নেই নেই সর্পের বিষ, নেই নেই দুখ নেই,
সুখ্ সুখ্ সুখ্ দাওগো চুমুক সুখের পেয়ালাতেই।
যদি পাও দুখ, আবার চুমুক দাও পেয়ালার মুখে,
মোর সুখ তরে লাগো আঙুরের ভাঙা থাক থাক্ সুখে।
আমি কবি,—মোর ছয়জনা সাকী পেয়ালা ভরিতে রত,
যাহোক্ বিশ্বে, আমার সুখ ত বামকরতলগত।
একটু আধটু যা দুঃখ আছে ধোরো না সে সব খেই ;—
বল,—নেই নেই সর্পের বিষ, নেই নেই দুখ নেই।
পরিশেষে প্রভু প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি আরবার,—
বন্ধুর করে তোমার প্রেরিত জুতার প্র-উপ-হার।
সবিনয় নিবেদন,—
মাঝে মাঝে পিঠে মেরে ভুলাইও বক্ষের কি বেদন। *

* গত ফাল্গুন সংখ্যার 'কল্লোল'-এ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের "দুঃখবাদী" নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির উত্তর স্বরূপ শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় শর্ম্মা মহাশয়ের নিকট হইতে "দুঃখবিবাদী" কবিতাটি আমরা পাই ও আষাঢ় মাসে প্রকাশ করি। এবারে আবার যতীন্দ্রবাবু "দুঃখবিবাদীর" 'প্রাপ্তিস্বীকার' করিয়া পাঠাইয়াছেন।

সম্পাদক

দীপক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

৯

রাত্রি প্রভাত হইল বটে কিন্তু দীপকের কাছে তাহা মোটেই সুপ্রভাত বলিয়া মনে হইল না। ইন্দারার কাছে মুখ ধুইতে যাইয়া ছেলেদের ভিতর গত রাত্রের ঘটনার নানা প্রকারের আলোচনা হইতেছে শুনিতে পাইল। সকলেই বড় মাষ্টার মহাশয়ের বিপদের কথা শুনিয়া বেশ যেন একটু আমোদ উপভোগ করিতেছিল। একজনও যে কেহ বড় মাষ্টার মহাশয়কে একটুও জব্দ করিতে পারিয়াছে—ইহাই যেন ছেলেদের কাছে সুখের কথা।

কেহ বলিল, হবে না? বেশ হয়েছে। যেমন বোজ রাত্তির ভোরটা পর্য্যন্ত বাইরে থাকা;—আর আমরা একটু গেলে অমনি মস্ত অপরাধ!

সুবিমল ছেলেটি বয়সেও বড় আর অনেককাল ধরিয়া বোর্ডিং-এ আছে। ভাল ছেলে বলিয়া তার নামও আছে। অন্য ছেলেরা বাইরে বেড়াইতে যাইতে হইলেও মাষ্টারের সঙ্গে যাইতে হয়, কিন্তু বোর্ডিং-এর কয়েকজন ছেলের জন্য জেলখানার মেট্-কয়েদীদের মত কিছু কিছু স্বাধীনতা মঞ্জুর ছিল। প্রয়োজন হইলে তাহারাই ছেলেদের খেলিতে বা বেড়াইতে লইয়া যাইত। তাহারা নিজেরাও স্বাধীনভাবে বোর্ডিং-এর বাহিরে যাইতে পাইত। সুবিমল ছিল এই দলেরই একজন।

ছেলেদের কথা শুনিয়া সুবিমল সহজভাবে বলিল, তোরা না জেনে শুনে কি সব বলছিস্? বড় মাষ্টার যে বিয়ে করছেন! তাই তিনি মেয়ের মার সঙ্গে অত রাত্তির পর্য্যন্ত সৎ-প্রসঙ্গ করেন।

কথাটা পড়িতে পাইল না। ছোটরা তেমন কিছু বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বড়রা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমনি হাসির রোলের মাঝখানে একটা মোটা নিমের দাঁতন মুখে করিয়া ধীরু-দা'র আবির্ভাব হইল।

এক টোপলা থুথু ফেলিয়া ধীরু-দা গম্ভীর মুখে বলিল, তোমাদের ভারী অন্যায়। বড় মাষ্টার মশাইকে নিয়ে এ রকম হাসি ঠাট্টা করা কি উচিত হচ্ছে? তাঁরা মাষ্টার, গুরুজন, তারা যা করেন তার বিচার কি আমরা করতে পারি?

সে কি গম্ভীর মুখের ভাব, কথা বলার কি রকম! সকলেই প্রথমটা মনে করিল, ধীরু-দা বুঝি সত্য সত্যই ঐ সব কথা বলিতেছে।

ঐ কথাগুলি বলিয়াই ধীরু সুবিমলের দিকে ফিরিয়া বলিল, তোমাদের মত ক'টা স্বার্থপর, কাপুরুষ আর নীচ বোর্ডারদের জন্যই আজ এই বোর্ডিং-এর ছেলেদের এই দুরবস্থা।

তারপর সকলের দিকে ফিরিয়া বলিল, দেখ, তোমাদের বলে রাখ্ছি, এই সুবিমল আজ ভোর না হতেই বড় মাষ্টার মশাইকে গিয়ে লাগিয়ে এসেছে যে, দীপকের পরামর্শে ও নেতৃত্বে বোর্ডিং-এর ছেলেদের এই কাজ! কাল রাত্রে নাকি তারাই বড় মাষ্টার মশাইকে পথে আক্রমণ করেছিল। এখুনি সবাইর ডাক পড়বে! আমি শুনে এলাম, বড় মাষ্টার আর নরেন মাষ্টারে মিলে কি সব পরামর্শ হচ্ছে। কিন্তু সে যাই হোক্, আমরা যা' শাস্তি পাই পাব, তার আগে সুবিমলকে একবার দেখে নেব।

কথাও যেমন বলা, অমনি এক ল্যাং দিয়া সুবিমলকে

একেবারে বাঁধান শানের ওপর ফেলিয়া দেওয়া। তারপর তার বুকের উপর বসিয়া ধীরু-দা অবিশ্রান্ত কীল চড় ঘুঁষী চালাইতে লাগিল।

নিঃশব্দে নীরবে কাণ্ডটা হইয়া গেল। সুবিমল উঠিয়া চলিয়া গেল।

ছেলেরা ফিস্ ফিস্ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, আর রক্ষে নেই, এবার সবাইকে বেত্ খেতে হবে। সুবিমল যে পেয়ারের ছেলে, তাকে মারা!

হঠাৎ পেছন দিক্ হইতে দীপকের ডাক পড়িল।— নরেন মাষ্টারের গলা।

নরেন মষ্টারটি দেখিতে রোগা লিক্‌লিকে। কিন্তু কসরৎ করিয়া হাতের গুল আর বুকের মাংস বেশ পাকাইয়া তুলিয়াছেন। এদিকে কোমর ভাঙ্গিয়া যায়, তবু বুক চিতাইয়া চলা চাই। তাঁর মস্ত বড় গৌরবের কথা, তিনি সর্ব্বদাই সকলের কাছে বলিয়া বেড়ান, অন্তত ছেলেদের কাছে।—'ভেতো বাঙালী' হইয়াও তিনি রীতিমত কয়েকমাস কাল একটা ব্যারাকে থাকিয়া খাজা গোরাপল্টনের সঙ্গে কসরৎ, কুচ-কাওয়াজ করিয়া তবে এই শরীরটি পাইয়াছেন। এবং কোনও কারণে একটা ফুটবল ম্যাচে একটা ফিরিঙ্গী-স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে দেশী স্কুলের ছেলেদের ঝগড়া বাধে; নরেন মাষ্টারই শেষকালে ফিরিঙ্গীর ছেলেগুলাকে মারিয়া তুলা-ধুনা করিয়া দেয়। এই বহুবার কথিত গল্পটি বলিতে বলিতে মাষ্টারের খর্ব্বাকৃতিটি লম্বায় একটু বাড়িয়া উঠিত, এবং গলা ও ছাতিটা ফুলিয়া উঠিত। দেখিতে ঠিক্ নোটন্ পায়রার মত দেখাইত।

এই নরেন মাষ্টার দীপকদের স্কুলে মাষ্টার হইয়া আসার পর হইতে বড় মাষ্টার মহাশয় ছেলেদের শাসনের ভার অনেকখানি ইঁহারই উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

নরেন মাষ্টার অন্তদিকে অল্প বুদ্ধি হইলেও কোন্ ছেলের সঙ্গে কতখানি মাষ্টারী ফলাইতে হইবে তাহা চট্ করিয়া বুঝিয়া লইতেন। ধীরু প্রভৃতি কেহ অন্যায় করিলে নরেন মাষ্টার তাহাদের পিঠে হাত দিয়া হাসিয়া বুঝাইয়া ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু দুর্ব্বল কোনও ছেলে যদি সামান্য একট দুষ্টামীও করিত তাহা হইলে নরেন মাষ্টার তাহার হাতের পাঞ্জাটি একবার তাঁহার হাতের মধ্যে লইয়া বেশ করিয়া টিপিয়া দিতেন। মুখে তাঁহার গর্ব্বের হাসি ফুটিয়া উঠিত।

এ হেন নরেন মাষ্টার দীপককে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, —ছেলেদের মধ্যে একটু ছোটখাটো সাড়া পড়িয়া গেল।

ঐ সময়েই প্রাতঃকালের হালুয়া' খাইবার ঘণ্টা পড়িল। ঐ বারান্দা-জোড়া দু'খানি, টেবিলের উপর কলাই-ওঠা লোহার রেকাবীতে এক এক হাতা করিয়া গরম হালুয়া প্রত্যহ প্রাতে বোর্ডিং-এর ছেলেদের ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য পরিবেশিত হয়। এই 'হালুয়া' জিনিষটির অনেক গুণ ছিল। তাহাতে ঘৃতের কোনও সম্পর্ক থাকিত না। কাজেই একবার গিলিতে পারিলে শরীরের উপকারই হইবার কথা। গরম অবস্থায় খাইতে পারিলে তবু খাওয়া যাইত, আবার ঠাণ্ডা হইয়া গেলে কাকেও খাইতে পারে না। কিন্তু না খাইয়াও উপায় ছিল না। হালুয়া না খাইলে গাল খাইতে হইত। দিনের আরম্ভেই কেহ বড় একটা গালি খাওয়া পছন্দ করিত না, সেই জন্য যেমন করিয়া পারে হালুয়াটুকু খাইয়া ফেলিত।

সেদিনও ঘণ্টা পড়িতে ছেলেরা হালুয়া খাইতে বসিল। 'মাসীমার' উপর ছেলেদের খাওয়া দাওয়ার ভার।

মাসীমা পাঁড়েজীকে হাঁকিয়া বলিলেন, ১৬ নং বাবুর হালুয়া তুলিয়া লইয়া যাও। কথাগুলি অবশ্য হিন্দিতেই বলিলেন।

ছেলেরা বুঝিল, এটা মাসীমার আদেশ নয়, হাইকোর্টের হুকুম!

খাওয়া বন্ধ হওয়া এ বোর্ডিং-এর একটা চলিত শাস্তি ছিল। তাই এক আধ বেলা উপবাসে থাকা প্রায় অধিকাংশ ছেলেরই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। আর অর্দ্ধাশন ত নিত্যকার ব্যাপার। মাছের টুক্‌রাটা বড়, বেগুন ভাজা-খানা একটু বড় পাইবার জন্য ছেলেরা পাঁড়েজীকে তাহাদের নূতন জামা কাপড় পর্য্যন্ত দিয়া ফেলিত।

হাজুয়া খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় নরেন মাষ্টার টেবিলের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আদেশ প্রচার করিলেন, ছেলেরা সকলে যেন খাওয়ার পর স্কুলের হল্-ঘরে উপস্থিত হয়, বড় মাষ্টার মহাশয়ের আদেশ। কথা কয়টি বলিয়াই মিলিটারী ভাবে রাইট্-এবাউট্-টার্ন্ করিয়া নরেন মাষ্টার চলিয়া গেলেন।

খাওয়া শেষ হইলে ছেলেরা দল বাঁধিয়া হল্-ঘরের দিকে চলিয়াছে। মাঝপথে ধীরু তাহাদের ডাকিয়া বলিল, তোমরা সকলে একটু দাঁড়াও, শোন।

ভাল-মন্দ ছোট-বড় সব ছেলেই ধীরুকে একটু একটু ভালবাসিত। বোর্ডিং-বাসের এই আত্মীয়হীন প্রবাসে রোগে দুঃখে ধীরু-দা সকলের সহায় ছিল।

তাই ধীরুর আহ্বানে সকলেই দাঁড়াইল।

ধীরু একটা বেঞ্চের উপর টপ্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, আজ দীপকের অদৃষ্টে বা অন্য যার অদৃষ্টে যে শাস্তিই থাকুক, আমাদের মস্ত বড় একটা সুখের কথা যে, বড় মাষ্টার মশাইর কীর্ত্তির কথা মাষ্টাররা এবং সব ছেলেরা জান্‌তে পেরেছে। আমরা অনেককাল থেকেই জানি, উনি অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরেন। আমাদের বাপ-মায়েরা এখানে এত টাকা খরচ করে পাঠিয়েছেন, ভাল হওয়ার জন্য, ভাল লেখা-পড়া শেখবার জন্য। সে কথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু মাষ্টাররা যেখানে এত অনিয়ম করেন, নিজেদের কাজে এত গাফিলি করেন, সেখানে ছেলেদের পড়াশুনার বা স্বাস্থ্য, শিক্ষা সম্বন্ধে যত্ন হওয়া অসম্ভব। কাল রাত্রে ঐ ছেলেটার পেটে ব্যথা হওয়া অবশ্য আমারই শেখানোর ফল। তার একটা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ আমি জান্‌তাম, বোর্ডিংশুদ্ধ তখন একটা হট্টগোল না বাঁধাতে পারলে ছেলেরা বা মাষ্টাররা কেউ টের পাবে না যে, বড় মাষ্টার কখন বোর্ডিং-এ ফেরেন এবং কাল রাত্রে তাঁর কি দশা হয়েছিল। আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু বড় মাষ্টার মশাই যখন আমাকে মিনতি করে বল্লেন, ধীরেন, সকলের সাম্‌নে যেন আমাকে অপদস্থ হতে না হয় এইটুকু তুমি দেখো। আমার সত্যি তখন একটু দয়া হয়েছিল। তাই আমি তাঁকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য তাঁরও ভেদবমী হচ্ছে বলে' সকলকে ভুলিয়ে রাখি। সে যাক্—তোমরা সকলে জেনে রাখ, রাত্রির ঘটনার জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী,—দীপক নয়। আমার সঙ্গে যারা ছিল, তারা আমার কথায় মেতেছিল মাত্র, তাদের কোনও দোষ নেই। দীপক যাতে শাস্তি না পায় আমি তার ব্যবস্থা করব। তোমরা সবাই চুপ করে থেকো। আর বাকী যা, আমি দেখে নেবো।

ধীরু-দা'র বক্তব্য শেষ হইতে সবাই হল-ঘরে উপস্থিত হইল।

এত সকালে হল-ঘরটিতে ভাল করিয়া আলো আসে না, তাই একটু একটু অন্ধকার তখনও। সেই অল্প অন্ধকারের মধ্যে বড় মাষ্টার মশাইর চশ্‌মা জোড়া এক প্রান্তে চক্ চক্ করিতেছে। আশে পাশে আরও সব মাষ্টাররা বসিয়াছেন। ছেলেরা সদলে গিয়া বসিল। 'মাসীমা' চাবীর গোছা দোলাইতে দোলাইতে ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিচার আরম্ভ হইল। বড় মাষ্টার মহাশয় স্থির ধীর অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, আমরা সকলেই জানি দীপক বেশ ভাল ছেলেই। সে বোর্ডিং-এ নূতন এসেছে। অনেক নিয়ম বিধি হয় ত সে জানে না। কিন্তু কাল সে একটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ করাতে আমরা তাকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়ে পারছি না। অবশ্য বোর্ডিং-এর কোনও ছেলেই এ রকম শাস্তি পায় তা আমরা ইচ্ছা করি না। তবু অত্যন্ত কষ্ট হলেও, নিরুপায় হয়েই আমরা দীপককে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে বাধ্য হচ্ছি। আশা করি, এই দৃষ্টান্ত দেখে ভবিষ্যতে বোর্ডিং-এর কোনও ছেলে আর অপরাধ করতে প্রবৃত্ত হবে না।

ধীরু-দা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, গুরুতর অপরাধটা যে কি তা' আমরা কেউ জানি না। কিন্তু সে অপরাধের জন্য দীপকই যে দোষী তা' কি জানা গেছে?

সমস্ত হল-ঘর ভরিয়া একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠিল।

বড় মাষ্টার মশাই তেমনি ধীরভাবে উত্তর করিলেন, ছেলেদের এ রকম প্রশ্ন করা অন্যায় এবং প্রশ্ন করলেও আমরা যা স্থির জান্‌তে পেরেছি তার জন্য ছেলেদের কাছে জবাবদিহির কোন প্রয়োজন মনে করি না।

তবু বলছি, দীপক নিজমুখে সকল দোষ স্বীকার করেছে।

ধীরেন তবু ছাড়িবার পাত্র নয়। সে সর্-সর্ করিয়া একেবারে মাষ্টারদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল এবং সেইখান হইতে বলিতে আরম্ভ করিল,—নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করলে যদি শাস্তি দেওয়া সঙ্গত হয় তাহলে আমাকে আপনারা শাস্তি দিন। যে গুরুতর অপরাধের কথা বড় মাষ্টার মশাই নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য প্রকাশ্যে উল্লেখ করছেন না, সে অপরাধের জন্য আমি সম্পূর্ণ দায়ী। আমাকে শাস্তি দেওয়া হোক্। দীপক এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি এও বলছি, অন্য ছেলেরা যারা সঙ্গে ছিল, হয় ত মাষ্টার মশাই সাহস করে তাদের নাম বল্‌তে পারছেন না তারাও নিজেদের ইচ্ছায় কেউ যায় নি।

ধীরেনের কথাগুলি শুনে যেন হল-ঘরের সব লোক স্তম্ভীত হইয়া গেল। সকলেই যেন আশা করিতেছিল—এর পর একটা প্রচণ্ড ঝড় আসিবে।

নরেন মাষ্টার এবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁর হাতে একখানি বেত। বেতখানি আস্ফালন করিতে করিতে তিনি বলিলেন, দীপকের সম্বন্ধে আমরা সকলে মিলে যে বিচার করেছি তার উপরে কেউ কোনও কথা বলা আমরা উচিত মনে করি না। দীপকের শাস্তি হবেই এবং সে শাস্তি গ্রহণের জন্য দীপককে প্রস্তুত হতে বলছি।

দীপক এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়াছিল, কোনও কথাটি বলে নাই। সে একটু আগাইয়া আসিল, ধীরেনের হাত ধরিয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিল। নরেন মাষ্টারের দিকে নিজের হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, আমার মতে কাল রাত্রে যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল তাদের সকলেরই শাস্তি গ্রহণ করা উচিত। আর কিছুর জন্য না হোক্, তাদের কাপুরুষতার শাস্তিস্বরূপ। এ শাস্তি তাদের প্রাপ্য। আমি কোনও মতেই ভুল্‌তে পারছি না যে, একজন লোককে দশ বারজন মিলে কি করে আক্রমণ করা যায়। তিনি মাষ্টারই হউন আর যেই হউন। অন্তত এ ক্ষেত্রে দশজনে মিলে মাষ্টার মশাইর মত একজন লোককে আক্রমণ করা নিতান্ত কাপুরুষতা হয়েছে। হয় ত সকলে সে কথা স্বীকার করবে না। কিন্তু আমার মনে এই ধারণা। তাই সকলের হয়ে আমি এই কারণে অনুতপ্ত এবং আমি নির্ব্বিবাদে এ শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আমাদের এটুকু শিক্ষা হউক্ যে, একজন সাধারণ লোককে জব্দ করার পক্ষে আমাদের একজনই যথেষ্ট।

কথাও শেষ হওয়া নরেন মাষ্টারের হাতের বেত দীপকের হাতের উপর সপাং করিয়া পড়িল। দীপক লজ্জায় অপমানে কাঁদিয়া ফেলিল। দ্বিতীয়বার হাত তুলিবার পূর্ব্বেই ধীরেন নরেন মাষ্টারের হাতের কব্‌জী বিপুল শক্তিতে চাপিয়া ধরিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাঁকিয়া বলিল, মাষ্টার মশাইরা শুনুন, দীপকের গায়ে যদি আর কেউ একটিবার হাত ছোঁয়ান তবে তাঁর মহা অনর্থ হবে, সে যিনিই হোন্। আপনারা এ রকম করে শাস্তি দিয়েই ছেলেদের আত্মসম্মানবোধ নষ্ট করে' দেন, তাদের লজ্জা ভেঙ্গে দেন্। যে ভয়ে আপনারা আমাকে শাস্তি দিলেন না, দীপককে এই এতগুলি ছেলের সাম্‌নে বিনা অপরাধে এ রকম জঘন্য শাস্তি দিলে তারও মনের ভয় লজ্জা সব চলে যাবে, সেও তখন আমারই মত হয়ে যাবে। তাকেও তখন আপনাদের ভয় করতে হবে।

এবার হেডমাষ্টার মশাই নিজে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নরেন মাষ্টারের হাত হইতে বেত লইতে গিয়া বলিলেন, দিন্ আমার হাতে বেত।

ধীরেন নরেন মাষ্টারের হাত ছাড়িয়া দিয়া সিংহের মত লাফাইয়া পড়িল এবং বড় মাষ্টার মশাইর সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁকিয়া বলিল, খবরদার মাষ্টার মশাই! এত সাহস করবেন না। আমি criminal, আমার ভয় লজ্জা কিছু নেই। আমার সাহসের সঙ্গে আপনার সাহসে কুলোবে না। আপনি যে লজ্জা ঢাক্‌তে কাল রাত্রে আমাকে অনুনয় করেছিলেন, সে লজ্জাটুকু আপনার এখনও আছে। আমার তাও' নেই। ছেলে দিতে বাপ মায়ের মনে কষ্ট হয় বলে' তাঁরা আমাকে আপনাদের বোর্ডিং-এ পাঠিয়েছিলেন ভাল হতে। কিন্তু এই অল্পকাল বোর্ডিং-এ থেকে যা' শিখেছি, যতখানি ছোট হয়ে গেছি, বাইরে থাক্‌লে হয় ত

তক্তখানি ছোঁতাম না। ঘরে ছিল বাবার চোখের জল আমার চিন্তায় তাঁর বিষণ্ণ মুখ, মায়ের স্নেহ যত্ন, ঘরের আদর ক্রুটি। হয় ত এ গুলিতেও আমাকে ফেরাতে পারত, কিন্তু আপনাদের এখানে কেবল সন্দেহ, যা করবে বলে' ছেলেরা ভাবতে পারে না, আপনারা আগে থেকেই সে সকলের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমি বেশী কথা বলতে চাই না। একটি কথা বলছি, কোনও বাপ-মা যেন ছেলেদের ভাল করতে এ ধরণের বোর্ডিং-এ না পাঠায়। আপনারা ভুলে যান্ কেন যে, আপনারাও রক্তে মাংসে গড়া মানুষ!

এই কথার পরই ধীরেন দীপককে প্রায় হাতের উপর তুলিয়া লইয়া হল-ঘরের বাহিরে লইয়া আসিল। কেহ বাধা দিল না, বা একটি কথাও বলিল না।

ধীরেন দীপককে লইয়া সোজা খেলার মাঠ পার হইয়া সেই মাঠের প্রান্তে একচালা পরিত্যক্ত ঘরটিতে লইয়া চলিল। পিছনে পিছনে সমস্ত বোর্ডিং-এর ছেলে ভাঙিয়া পড়িল। বোর্ডিং-এ কোনও কালে এমন ব্যতিক্রম আর হয় নাই। পড়ার ঘণ্টা, স্নানের ঘণ্টা, খাওয়ার ঘণ্টা পড়িবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও সে দিন আর কোনও ঘণ্টাই পড়িল না। অন্য দিন অতবড় বোর্ডিং-টা প্রায় শ' খানেক ছেলের কোলাহলে মুখরিত হইয়া থাকিত, আজ যেন তাহা জনশূন্য পরিত্যক্ত অট্টালিকার মত মনে হইতেছিল।

বোর্ডিং-এর একচালা ঘরটির একটা নাম ছিল। ছেলেরা আদর করিয়া ঘরটির নাম দিয়াছিল ;—"মামার বাড়ী।"

এদিকে 'মামার বাড়ী'র সামনের মাঠে মস্ত বড় মিটিং জমিয়াছে। যাহারা বোর্ডিং-এ আসিয়াও ধূমপানের অভ্যাস ছাড়াইতে পারে নাই, তাহারা মামার বাড়ীতে বসিয়া সিগারেট্ খাইত। আজ একেবারে ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াই খাইতে সুরু করিল।

ধীরেন সমবেত ছেলেদের বোর্ডিং-এর রীতি নীতি ও আচার ত্রুটির কথা ওজস্বিনী ভাষায় বুঝাইতে ব্যস্ত। দীপক মাথা নত করিয়া তাহারই পাশে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

ধীরেন তাহার বক্তব্য শেষ করিবার সময় বলিল, আপনারা অনেকে চরিত্রবান্, ভাল করে লেখা পড়া শিখবেন বলে' এখানে এসেছেন। এত কালের মধ্যে আপনারা আমাদের মত ছেলেদের সঙ্গে কথাও বলেন নি। কিন্তু আজ এখানে এসেছেন। সমস্ত তরুণ মনের যে একটা ক্ষোভ তা' আপনাদের মনেও সাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই আজ আমরা কে সে কথা ভুলে গিয়ে আমাদের সঙ্গও আপনাদের বিরক্ত করছে না। আপনা-দেরও আমি আমার মনের একটা কথা বলি। আমি নানা কারণে নিজেকে শাসন করতে না পেরে এ বয়স পর্য্যন্ত বহু অন্যায় কাজ করেছি, কিন্তু আজ সঙ্কল্প করছি অন্তত একটা ভাল কাজও আমি করব। এ বোর্ডিং আমি ভেঙ্গে দেব। মানুষ স্নেহে মমতায় নিজেদের সংশোধন করবার অবকাশ পাক্, অপরের তাড়নার নিষ্পেষণে যেন তাকে জীবনের উচ্চ আদর্শের কথা একেবারে ভুলে যেতে না হয়। অন্তত আমার মত যেন আর কারো অদৃষ্ট না হয়। আপনারা যদি কেউ মনে করেন, এ রকম ধরণের বোর্ডিং-এর কোনও উপকারিতা আছে, তা হলে আপনাদের কর্ত্তব্য হবে, মন তরুণ থাক্‌তে তরুণদের শিক্ষার ভার আপনারা গ্রহণ করেন। ছেলেদের মনের অভিযোগ, দুঃখ, দুষ্টামী বা আশার কথা ছেলেবয়েস না হলে বোঝা যায় না। বড় হয়ে গেলে বিগত দিনের তরুণ মনের কথা মনে হয়ে তরুণদের কেবল সন্দেহই করতে ইচ্ছে হয়। তরুণ প্রাণের কাছে তরুণের যে সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের আশা থাকে বড়দের কাছে তা' থাকে না। একমাত্র স্নেহের স্পর্শ, ছোট একটু সহানুভূতিই বিচলিত তরুণ মনকে ফেরাতে পারে, তা ছাড়া আর কিছুতে নয় এটা আমি অন্তত স্পষ্ট জেনেছি। কত নীচ ও জঘন্য প্রবৃত্তির সমাবেশে এ রকম শিক্ষাভবনগুলি যে কলুষিত তা' আপনারা অনেকে জানেন না। ছেলেদের এখানে থাকাই বিপদ।

সে দিনের মত সভা ভঙ্গ হইল।

দীপক সে রাত্রি আর ঘুমাইতে পারিল না। কি যে একটা জ্বালা তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল তাহা সে নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

সময়ের অবকাশে অনেক জিনিষ সারিয়া যায়, দীপকের মনও সুস্থ হইল।

এই একটি ঘটনাতেই তাহার মন বিকল হইয়া গিয়াছিল। ঐ বোর্ডিং-এ থাকা তাহার পক্ষে তখন বিরক্তিকর ও ঘৃণাজনক বলিয়া মনে হইত।

বছর কয়েক তাহাকে থাকিতেই হইল। এই দীর্ঘকাল বোর্ডিং-এ থাকিয়া তাহাকে অনেক কিছু জানিতে হইল, শিখিতে হইল।

একবার তাহার ছোট বোনের বিবাহ উপলক্ষ্যে সে বাড়ী আসিল। বোনের বিবাহ হইয়া গেল। বড়-দা জানাইলেন, এখন আর টাকা পয়সায় কুলায় না, তাহার আর বোর্ডিং-এ থাকা চলিবে না।

নীলাম্বরের মা এখন অন্ধ, কিছু আর চোখে দেখিতে পায় না। তবুও চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহার কুষ্ঠিতে লেখে না। ছোট একখানা খুর্‌পী লইয়া সকাল সন্ধ্যা উঠানের ঘাস চাঁছে, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া গোবর জল দিয়া কাক না ডাকিতে উঠিয়া ঘরগুলির পিড়ে লেপে, দুপুর বেলা ইহাকে উহাকে ধরিয়া রামায়ণ মহাভারত পড়াইয়া শোনে।

দীপককে পাইয়া নীলাম্বরের মা যেন হাতে চাঁদ পাইল। সকলকে গর্ব্ব করিয়া বলিত, দীপু আমার যা শিখেছে তাতেই একটা দারোগাগিরি পাবে।

দীপক আবার বাড়ী থাকিয়াই পড়া সুরু করিল।

বিকালে স্কুল হইতে আসিয়া দীপক নীলাম্বরের মা'র সঙ্গে গল্প করিত। তাহাদের বাড়ীর ভিতরকার উঠানে একটা বেলগাছ, তাহারই গোড়াটা মাটী দিয়া উচুঁ একটা বেদীর মত করা ছিল। রোদ পড়িয়া আসিলে নীলাম্বরের মা সেই বেলতলায় বসিয়া সুপারি কাটিতে বসিত, আর কখন দীপক বাড়ী ফিরিবে তাহারই অপেক্ষা করিত।

টম্ কুকুরটা মরিয়া গিয়াছে। চাঁদা এখন এক উকীলের আস্তাবলে থাকে, তাহার বড়-দা গাড়ীর সঙ্গে তাহাকেও বিক্রী করিয়া দিয়াছেন। বংশী পেন্সন লইয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। মালীর মেয়ে চন্দনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। একবার নাকি ভীষণ ঝড় হয়, দীঘির পাড়ের বড় ঝাউগাছ দুইটা তাহাতে পড়িয়া গিয়াছে।

দীপকের পুকুর বাগান সব বুঁজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর বাগানের অনেক ছোট গাছগুলিতে এখন ফুল ধরে, ফলের গুলিতে ফল ধরে। দীঘির পূবপাড়ের মুসলমানদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখন বড় সড় হইয়াছে।

একদিকে যেমন বাড়ীর অনেক পুরাণ জিনিষ হারাইয়া গিয়াছে, তেমনি আবার অনেক নূতন জিনিষ জন্মলাভ করিয়াছে, বড় হইয়াছে।

পরিবর্ত্তনের এই চিরন্তন্ ধারাটি দীপকের যেন একতকাল পরে এই প্রথম চোখে পড়িল।

—ক্রমশ

সঞ্চয়

হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়

পড়ে মনে সেই একদিন ;—
সুচির নবীন
বসন্তের পুষ্পরেণু মাখি
মোর পরে চক্ষু দু'টি রাখি
বলেছিলে "তুমি মোর হবে" ;
প্রেমের গৌরবে
সেদিন ভাবিয়াছিনু আদি-অন্তহারা
চিররুদ্ধ এই মোর জীবনের ধারা
সহসা উঠিবে ভরি কলহাস্যগানে
ছন্দভরা নিঝরের আনন্দের তানে !

তার পরে গেল কতকাল ;
সুখে দুঃখে কত অন্তরাল
আপনি গড়িয়া উঠি ভাঙিল কখন,
ব্যর্থ আকিঞ্চন,
কখনো কুসুম হয়ে উঠিল মুঞ্জরি,
কখনো দুঃখের বায়ে পড়িল সে ঝরি !
কত আশা আকাঙ্ক্ষার বাণী
দিল আনি,
শ্যামল বনের রেখা বিস্মিত ধরণী ;
প্রেমের তরণী
আশঙ্কার ঝঞ্ঝাবায়ে হারালো দুকূল,
কত মান, অভিমান বাসনার ভুল।

তোমা লাগি চলেছি যে পথ
প্রতীক্ষায় মোর মনোরথ
চেয়েছিল শুধু নির্নিমেষে
কবে বেলা শেষে
তোমার আনন্দ দীপ উঠিবে গো জ্বলি
অধরে হাসির ধারা উঠিবে উছলি !

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এই জাহাজে রোজই যাত্রীরা সকাল থেকে উঠে ভাবেন, কেমন ক'রে সারাদিনটা হৈ হৈ ক'রে কাটানো যাবে। খাওয়ার সময়ে তুরীধ্বনির আওয়াজে আমোদ প্রমোদের স্বাহূত সেক্রেটারী ভদ্রলোক তাঁর নিত্য নূতন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। কোনদিন রং-বেরঙের পোষাক প'রে ভদ্রমহিলা ও 'ভদ্রমহল'গণের নৃত্য সাব্যস্ত হয়, কোন দিন গানের ও হাসি তামাসার আসরের উদ্যোগ হয়, কোনদিন পুরুষদের নারী সেজে নারীর হাবভাব নকল ক'রে আনন্দ দান করা নির্দ্দিষ্ট হয়, কোনও দিন whist-drive-এর সরঞ্জাম ঠিক করা হয় (দল বেঁধে বিরাট তাসের আসরকে বলে whist-drive)। তা ছাড়া ডেকের নীচেই মোটা টার্পলিনের বেড়ায় সমুদ্রের জল আটকে স্ত্রী-পুরুষের সাঁতারের বন্দোবস্তে, হাসাহাসির কলরোলে ও সেই জলে লম্ফপ্রদানের দৃশ্য যাত্রীগণকে প্রহৃষ্ট করার চেষ্টাটা জাহাজের আনন্দের প্রায় একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবস্থা।

একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে সেক্রেটারী প্রমুখ উদ্যোক্তাগণের নিত্যনব উদ্ভাবনী প্রতিভার প্রশংসা না করেই পারা যায় না। সেদিন বার জন পুরুষের বার রকম ধরণ-ধারণে নারী সাজার দৃশ্যের মধ্যে হয় ত সব স্থলে সৌকুমার্য্য (refinement) বা সুরুচির মর্য্যাদা রাখা হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সেই ভাঁড়ামিতে সুকুমার চিত্ত ললনা সম্প্রদায়কেই সব চেয়ে প্রহৃষ্ট হয়ে উঠতে দেখা গেল। সে যাই হোক, এ আয়োজনের সৌকুমার্য্যের অভাবটাই তার সব চেয়ে বড় কথা নয়, সব চেয়ে বড় কথা এই যে, এত রকম ঢঙও এদের মাথায় আসে। সময়ে সময়ে মনে হয় যে, এদের মেয়েরা এতে এতটা আমোদ না পেলে পুরুষদের এ সব আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তে খুব সম্ভবত বেশী উৎসাহ থাকত না। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে যে সমাজে মেয়েদের সাহচর্য্য ও সহযোগের প্রেরণা আকাশে বাতাসে চারিয়ে থাকে সেই সমাজেই পুরুষদের সৃষ্টি-প্রতিভার সব চেয়ে বেশী স্ফুরণ হয়।

কথাটা খুবই সত্য মনে হয়, এবং তুলনায় এর সত্যতাটি আরও বেশী উপলব্ধি করা যায়। আমাদের গজেন্দ্রগামী সভ্যতার জীবনীশক্তিটি আজ মন্থরগতি হওয়ার একটা মস্ত কারণ নিশ্চয়ই এই যে, আমাদের সমাজে পুরুষদের উৎসবানন্দে নারীকে আমরা নন্-কো-অপারেটার করতে বাধ্য করেছি। এদের সভ্যতায় ললনাসম্প্রদায় সম্প্রতি ঘরের দাবীকে হয় ত একটু বেশী উপেক্ষা করতে সুরু করেছেন কিন্তু তার ফলে পাশ্চাত্য নর-নারীর গৃহস্থ জীবনের লোকসানের অনেকখানি ক্ষতিপূরণ যে তাদের বাইরের জীবনের সম্পদ বৃদ্ধিতে মেলে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। এখানে আবার আসে সেই question of value. য়ুরোপের গৃহজীবনে স্বতউৎসারিত স্ফূর্ত্তির প্রেরণা ক্রমেই কমে আসছে, কেন না য়ুরোপে গৃহজীবনের মধ্যে সেখানকার মানুষ আর আগেকার মতন সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু অপর দিকে য়ুরোপের বাইরের প্রাণশক্তির আখড়ায় জনসমাগম যে ক্রমেই বেশী হচ্ছে এ কথাও সমান সত্য। কাজেই বলতেই হয় যে, বাইরের জীবনের দাবীর মূল্যই এরা বেশী দিচ্ছে। আমাদের সভ্যতায় সম্ভবত ব্যাপারটা দাঁড়ায় উল্টো।

কিন্তু সে দর কষাকষির সমস্যার যতই কেন না স্থির মনে সমাধান করতে প্রয়াস পাই না, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পাশ্চাত্য সমাজে নারীর ক্রমেই পুরুষ হয়ে ওঠার দৃশ্যে অন্তত আমরা কোন মতেই

অবিচলিত থাকতে পারি না। আমাদের সন্দিগ্ধ প্রাচ্য-মনটি মাথা নেড়ে বলেই বলে: "কাজটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। কেন না যতই কেন না তর্ক করি, নারী আসলে গৃহেরই অধিষ্ঠাত্রী, ক্রিয়াকর্ম্মেরই অন্নপূর্ণা, স্নেহ-প্রীতি-প্রেমেরই প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাকে তার ক্ষেত্র থেকে উপড়ে আনলে গৃহজীবনের মূল শিকড়টির প্রতিষ্ঠা হবে কোন্ মাটিতে? এককথায় তাহলে সংসারে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য থাকবে কেমন করে?'

প্রাচ্য সুধীর এই শিরঃসঞ্চালনকে নব্যা নারীগণ উড়িয়ে দিয়ে আজকাল বলছেন: 'কিন্তু তোমাদের কে বলল যে গৃহের অনড় অচল মূল শিকড়টি হয়ে উদ্ভিদ-জীবনযাপন করাতেই আমাদের চরিত্রের চরম সার্থকতা? কারণ, সমাজ সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা তোমরা, অর্থাৎ পুরুষেরা এতদিন ধরে দিয়ে এসেছ, কোন্ জীবন দেবতার অনুশাসনে আমরা সে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশকে শিরোধার্য্য করে নেব বল?"

এ প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর আছে কি না বলা কঠিন এই জন্যে যে, আমাদের সংসারে অসুবিধার ওজরকে কোন মতেই যুক্তি বলে ধরে নেওয়া চলে না। (আর তাকে যুক্তি বলে চালালেই বা মেয়েরা শুনবে কেন?) তাই এদের পুরুষেরা যখন বল্লে: "হে শুভদে! তোমার মুখে সিগারেট শোভন নয়, তোমার মেঘবিনিন্দিত কেশদামই তোমার পরমসম্পদ, তাকে হৃদয়হীন ভাবে বামন করে দেওয়াটা আমাদের নয়নমনের প্রতি নিষ্ঠুরতা, তোমার কুসুমকোমল অঙ্গলাবনীকে swiming costume-এর কঠিন চাপে বিমর্দ্দিত করা সুষ্ঠু নয়, তোমার অশ্বপৃষ্ঠে খরগোসকুল নির্ম্মূল করার প্রয়াস নেত্ররঞ্জন নয়—ইত্যাদি ইত্যাদি";—তখন বরদা একান্ত অবজ্ঞার সুরে আমাদের যুক্তিকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন: "তা হোক্‌গে পুরুষপ্রবর! সংসারে যদি এমন কিছু থাকে যা পুরুষকেই সাজে, মেয়েকে নয়, তাহলে আমাদেরই সেটা আবিষ্কার করতে দাও। কেন না, তোমাদের 'চোখে ভাল লাগে না', পুরুষের এ অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রেও আর আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করতে পারছে না!"

তবু এটা সত্যি কথা যে, এ জাহাজে মেয়েদের এমন অনেক অশোভন প্রগল্‌ভতা প্রায়ই চোখে পড়ে যার অনুমোদন করা অন্তত আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের চক্ষে মেয়েদের তাণ্ডব নৃত্য, সময়ে অসময়ে গায়ে ঢলে পড়া, স্বল্প পরিচিত পুরুষবন্ধুর মুখে ঠাট্টাস্থলে এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে রসিকতা করা প্রভৃতি ভাল ঠেকে না অথচ পুরুষে পুরুষে এ রকম প্রগলভতা অনুচিত বা অশোভন মনে হয় না। তবে তা সত্ত্বেও জোর ক'রে অস্বীকার করা যায় না যে, 'চোখে ভাল ঠেকে না'—এটা একটা অকাট্য যুক্তি নয়। আমার এক বাঙালী বন্ধুর স্ত্রী মধ্যপ্রদেশে একদিন আমাকে একা টম্‌টমে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন এক জঙ্গলে ও সেখানে বন্দুক হস্তে দুটি পাখী শিকার করেছিলেন। বেশ মনে আছে, আমার চোখে সেদিন সেটা ভাল ঠেকে নি। কিন্তু কোনও যুক্তি দিয়েই প্রমাণ করা কঠিন যে, এ ভাল না-লাগাটা কোনও কিছুর ঔচিত্যের একটা সত্য মাপকাঠি। কারণ দ্বিতীয় দিন আমার বন্ধুপত্নীর বন্য হংস শিকার আমার চোখে সম্ভবত তত খারাপ ঠেকত না।

কিন্তু যতই কেননা সাদা যুক্তির চশমা চোখে পরি, নারীকে বড় ক'রে দেখার, তাকে শোভন ও সুন্দরের আধার প্রতিপন্ন করার,—এককথায় জীবন-মন্দিরে তার কল্যাণী মূর্ত্তিটিকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা পাওয়ার মধ্যে একটা সত্য সার্থকতা আছেই আছে। সমাজতত্ত্ববিৎ হয় ত সভ্যতার আদিম যুগ হতে আজ অবধি ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জগতে কুটিলতা ও অসুন্দরের আমদানীর জন্যে নারীর দায়িত্ব পুরুষের চেয়ে কখনই নিতান্ত কম হয় নি; বিবাহিতেরা হয় ত হেসে বলতে পারেন যে, নারীকে বড় ক'রে দেখেন কেবল তাঁরাই যারা নিকট-পরিচয়ের অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে তার স্বরূপ পরিচয়টি কখনো পান নি; প্র্যাকৃটিকাল লোকেরা হয় ত বলতে পারেন যে, নারীর নারীত্বের মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে কিন্তু সেটা যে সুন্দর ও শোভনের দিকেই হতে হবে এটা নিছক কবিকল্পনা; কিন্তু তবু অবাধ্য মন 'মানে না মানা'। সে বলে: "না না, এ ত সত্য নয়,

শুদ্ধার অঞ্জনের মধ্য দিয়েই যে নারীর প্রকৃত রূপটি ফুটে ওঠে এটা স্বপ্নকল্পনা হতে পারে না, বরং ঠিক উল্টো, এই অঞ্জনের আলোতেই নারীর যথার্থ স্বরূপটি আমাদের কাছে তার গভীরতম সত্যটি নিয়ে প্রতিভাত হয়।" বস্তুত আমাদের মধ্যে যে দেবত্বের গৌরব ও রহস্য আছে, উপহাস ক'রে সাধারণের চোখে তাকে খাটো করা খুবই সহজ। কেন না অধিকাংশ মানুষই জীবনের নিহিত রসটির গোপন আস্বাদ ত পেতে চায় না। জীবনের গোপনতম সুধাধারার বর্ণনা তাই তাদের কাছে ত কাল্পনিক ও হাস্যাস্পদ মনে হবেই। কিন্তু তাতে ক'রে সত্যের চিরন্তন গৌরবকে তার সিংহাসনচ্যুত করা যায় না। তাই নিঃসঙ্কোচে নারীকে বড় ক'রেই যেন দেখতে পারি; যেন বলতে পারি যে, বিধাতা তাকে তাঁর সৃষ্টি বিধানে গৃহাঙ্গনের নিরালা উদ্যানটির স্নেহ-ভালবাসার মুক্ত আলো হাওয়ার আদরেরই উপযোগী ক'রে গড়ে ছিলেন— দৈনন্দিন জীবনের কাড়াকাড়ি ও যুদ্ধবিগ্রহের সমস্যার সমাধানের ভার নির্দ্দেশ ক'রেছিলেন মূলত পুরুষেরই জন্যে। নারী আজকের দিনে বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট এই বিধি-ব্যবস্থা উল্টে দিয়ে পুরুষের প্রতিযোগী হয়ে দৈনন্দিন জীবনের কুশ্রীতার আখড়ায় নামছে বটে কিন্তু মনে হয় যে এ অসুন্দর আবহাওয়া থেকে খানিকটা অব্যাহতি না পেলে মানুষ কখনো তার অন্তরের প্রকাশোন্মুখ সুধা-উৎসের সন্ধান পেতে পারে না, যেহেতু প্রতি বড় বিকাশই নির্ভর করে অনুকূল আলো-হাওয়ার উপর। এবং সেই জন্যেই মনে হয় যে, অদ্যাবধি সব সভ্যতারই একটা শ্রেষ্ঠ প্রয়াস হয়ে এসেছে যাতে নারী মানুষের হৃদয়-রাজ্যের সম্পদের খনির মধ্যে নিতুই নবপ্রেরণার আলো আবিষ্কার করার সুযোগ বেশী ক'রে পায়। অন্তত পুরুষ যদি এ ভাবে শ্রমবিভাগ ক'রে নিয়ে থাকে তাহলে তাকে শুধুই দোষ দেওয়া চলে না।

য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি ডাকে, প্রতি চমকে আমাদের মনটা বোধ হয় অনেক সময়েই একটু অপ্রত্যাশিত ভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। সুতরাং এ জাহাজে অধিকাংশ তরুণীর ভাব-ভঙ্গী ও ধরণ-ধারণে যদি আমরা অনেক সময়ে একটু বেশীই বিচলিত হয়ে উঠি, তাহলে তাকে হয় ত খুব দোষ দেওয়া চলে না। কেন না, মানুষ কোনো মতেই তার আবাল্য সংস্কারকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে না। এতে যদি দোষের কিছু থাকে তবে সে দোষ আমাদের মনের নয়, সে দোষ তাঁর যিনি এ মনকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি এ বিচিত্র সৃষ্টিলীলাকে বিধৃত করে আছেন। তাই এ জাহাজের প্রাণচঞ্চলতায় আমাদের দু' একজনের মন কেমন ভাবে সাড়া দিয়েছিল সেটা বর্ণনা করা উপলক্ষ্যে এ সমাপ্তিহীন গতিশীলতার একটু সমালোচনা করব।

এ জাহাজে মাত্র দুটি বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। একজন এডেনে নেমে গেলেন—দু বৎসর সেখানে চাকরী ব্যপদেশে থাকবেন ও আর একজন লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়তে যাবেন। এ জাহাজের অবিরাম স্ফূর্ত্তির স্রোতের আবর্ত্তে কেবল আমরা তিনজন পড়ি নি বলে মনে হয়। আমাদের পরস্পরের গল্পালাপ ও আলোচনা উপলক্ষ্যে আমরা তিন জনেই অনুভব করতাম যে, আমাদের স্থান যেখানেই থাকুক না কেন, এখানে যে নয় সেটা নিশ্চিত। আমরা কখনও কখনও হয় ত এদের স্ফূর্ত্তির স্রোতে একটু আধটু ভেসেছি, কিন্তু কখনও যে সে স্রোতে মনেপ্রাণে এদের মতন গা ভাসিয়ে দিতে পারি নি সেটা নিশ্চিত। আজ কাল শুনতে পাই, অনেক বিশ্বপ্রেমিক নাকি বলছেন যে, জাতিগত গুণাগুণ বলে বিশেষ কিছু নেই—মানুষ সহজেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির দোষগুণ একান্ত আপনার করে নিতে পারে।

এক সময়ে এ কথায় মনটা খুব সাড়া দিত মনে আছে। কিন্তু আজ কই ও কথাটা আর তেমন সত্য মনে হয় না। মনে হয় যে জাতীয় মনোভাব ব'লে একটা জিনিষ আছেই। অবশ্য আমি বলতে চাইছি না যে, বহু দিন বিদেশে থাকলে বিদেশীর মনকে ঠিক স্বদেশীয়ের মনের মতনই চেনা যায় না বুদ্ধির দিক দিয়ে। কিন্তু এ বুদ্ধির দিক দিয়ে যতই কেন না তাদের চিনি, মনের দিক দিয়ে একটা সত্য ব্যবধান বোধ হয় তাদের সঙ্গে চিরকালই থেকে যায়। ফলে তাদের আচারব্যবহার বুঝতে সক্ষম হতে পারি বটে কিন্তু ঠিক তাদের মতন করে তাতে সাড়া দিতে পারি না।

তাদের মনোভাবের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারি বটে কিন্তু তাদের মনটিকে একান্তভাবে নিজের করে নিতে পারি না। কেন না, বাল্যের সংস্কার অভ্যাস ও ধারণাকে আমরা যত দৃঢ়মূল মনে করি বস্তুত তাদের শিকড় আমাদের হৃদয়ের ঢের বেশী গভীর স্তরে গিয়ে পৌঁছয় মনে হয়। এ কথা আজকাল নাকি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদরা স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন। *

এ কথাটি এই সামুদ্রিক জীবনের সম্বন্ধে আমাদের মনের সমালোচনার ধারাটি লক্ষ্য ক'রে সম্প্রতি প্রায়ই মনে হয়। কেন না তর্ক ক'রে মানবমৈত্রী বোঝালে হবে কি, স্পষ্ট দেখছি যে, ওদের সঙ্গে আমাদের আনন্দ ও রসসঞ্চয়ের প্রকৃতির মধ্যে একটা মস্ত তফাৎ আছেই আছে! ... আমার সঙ্গী বাঙালী ভদ্রলোকটি আমাকে কাল বল্‌ছিলেন যে, এদের প্রবীণেরাও যে রকম মুখে কালি-ঝুলি মেখে সঙ সেজে নেচে গেয়ে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপিতে আনন্দ পায় সে রকম আমোদপ্রমোদে আমাদের দেশে সাড়া দিতে পারে কেবল দন্তহীন শিশুরা ও মহরম-চড়কের সঙেরা। কি বুড়ো বুড়ো ছেলেমানুষ এরা, ধন্যি!

এদের নিরন্তর ব্যস্ততার জন্যে এদের প্রতি বিমুখতাটা আমার নিজের মনে এত গভীর হয়ে উঠতে পারে নি বোধ হয় শুধু এই জন্তে যে, আমি এদের সংস্পর্শে আমার বন্ধুবরের চেয়ে ঢের বেশী এসেছি। কিন্তু মনে মনে ওজন করে দেখতে গেলেই দেখেছি যে, মূলত এদের আনন্দ পাওয়ার ধরণধারণে সাড়া দেওয়ার আমার পক্ষেও সমানই অসম্ভব। য়ুরোপে আমার মতন প্রকৃতি কখনই সার্থকতার আস্বাদ পাবে না—তা য়ুরোপকে আমি যতই কেন না বড় করে ধরি।

অবশ্য আমি এ কথা জোর করে বলতে চাইছি না যে, এমন কোনও ভারতীয়ই থাকতে পারেন না যিনি মনে প্রাণে এদের আচার ব্যবহারে অনেকটা এদেরই মতন সাড়া দিতে সক্ষম। প্রতি সভ্যতায়ই এমন কয়েকজন লোক থাকেন দেখা যায় যাঁদের মূল প্রবণতাটি বস্তুত নিজের সভ্যতার পারিপার্শ্বিকে গড়ে ওঠে নি; তারা চিরকাল স্বদেশে থাকিলেও আমরা বিদেশী থেকে যাব। কিন্তু এঁদের আমি ব্যতিক্রম বলতে চাই। আমি বল্‌তে চাই যে, প্রতি সভ্যতার একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, যে ধারার প্রভাবে সে-সভ্যতার সজীব মনগুলি বিশেষ ভাবে গড়ে উঠতে বাধ্য। এবং প্রতি সভ্যতার সজীব মনগুলি যখন এ কথার এই একটা বিশেষ দিকে পরিণতি নেয়, তখন সেটা চিরকালের জন্যেই নিয়ে থাকে। তখন ভারি একটা চিত্তাকর্ষক জিনিষ দৃষ্টিগোচর হয়—আমাদের উভয় জাতির এই outlook-টির ভেদের জন্যে। অর্থাৎ আমরা দেখি যে, নানাজাতীয় মানুষের মধ্যে ঐক্যটাও যেমন সত্য, অনৈক্যটাও তার চেয়ে কম সত্য নয়, শুধু তাই নয়, এ অনৈক্যটা দৃশ্যত অনেক সময়েই গৌণ মনে হতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুত বিদেশী আচার ব্যবহারের আব্-হাওয়ায় বহুকাল থাকা যে কষ্টকর হয়ে ওঠে তার মূল হেতু—এই সব গৌণ কারণেরই সমষ্টি। মনে পড়ে বহুদিন আগে য়ুরোপে একটি রুষ মহিলার কাছে একটি গল্প শুনেছিলাম। তাঁর এক রুষ-বন্ধু দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে সুইট্‌জরল্যাণ্ডে স্বদেশের একটি টবের বৃক্ষলতার দিকে রোজ চেয়ে চেয়ে থাকতেন। মনে হচ্ছে, তাঁর বিধুর মনটির স্পষ্ট ছবি যেন চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছি। ...

আসল কথা, যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে বিদেশীকে আমরা ভালবাসতে পারি কিন্তু তার মনটির মন্দিরে প্রবেশ করে তার আবেগ অনুরাগের বেদীতে ব'সে তাদের আচার ব্যবহারের প্রতিমাকে কখনই ঠিক তাদের মতন উচ্ছ্বাস-অশ্রুর চন্দন-কুঙ্কুমে অর্চনা করতে পারব না, কারণ আমাদের মনোজগতের যে সব অভ্যাস ও দেখবার ধরণ-ধারণকে আমরা বস্তুত নৈমিত্তিক মনে করি—সেই সবগুলি

* Bertrand Russel-এর নব প্রকাশিত Education বইখানি দ্রষ্টব্য। তিনি তাতে দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, প্রতি মানুষের শিক্ষার প্রথম কয়েক বৎসরের প্রভাব যে কত বেশী তা আমরা এখনও যথেষ্ট উপলব্ধি করি নি। তিনি এমন কথাও বলছেন যে, প্রথম পাঁচ বৎসরের শিক্ষার উপর একটি শিশুর চরিত্রের গোড়াকার গভীর প্রবণতাগুলির গঠন সব চেয়ে বেশী নির্ভর করে।